বেঁচে থাকার দরজা

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

চরিত্র

গৃহকর্তা
কমলা। ঐ গৃহিণী
অনিল, সুনীল, বিমল,
সোনা। ঐ ছেলেরা
সুকুমার। অনিলের বন্ধু...
অসীমা। ঐ স্ত্রী
তপন। সোনার বন্ধু
হীরেন। বিমলের বন্ধু
একজন শ্রমিক। লোকটি

কলকাতার কাছেই এক স্বল্পবিত্ত গৃহস্থের ঘর। সাধারণ ভাবে ঘরে যা থাকে তাই আছে। একপাশে একটা চৌকি। তাতে বিছানা পাতা। দেওয়ালের দিকে কিছু বাকস প্যাটরা। দু-একটা কাঠের চেয়ার ও বসবার দু-একটা টুল রয়েছে এ'দিক ওদিক।

ঘরের দু'পাশে দু'টি দরজা বন্ধ।

সন্ধ্যা। বাইরের দরজায় আঘাত হবে।

অসীমা॥ [ভিতরে] —কে?

[আবার দরজায় শব্দ হবে। প্রবেশ করবে]

কে?

বাইরে সোনা॥ আমি—

অসীমা॥ সোনা ঠাকুরপো!

সোনা ॥ হ্যাঁ। [দ্রুত দরজা খুললেন অসীমা। সোনা আসবে। বয়েস ষোল। মালকোচা মেরে কাপড় পরা। হাফসার্ট গায়ে। হাতে বই।]

অসীমা ॥ খোঁজ পেলে? [অসীমার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা]

সোনা ॥ না—

অসীমা ॥ কোন খোঁজই পেলে না?

[অসীমার কণ্ঠে হতাশার সঙ্গে উৎকণ্ঠা বাজবে]

সোনা ॥ না—

অসীমা ॥ কোন খবরও রেখে যায়নি…কারুর কাছে…?

সোনা ॥ না—

অসীমা ॥ না— [হতাশায় অসীমার গলা বুজে এল]

[একটু নীরবতা। সোনা বইপত্তর একটা টেবিলে রাখল]

সোনা ॥ কেউ নেই তো সামনে…

অসীমা ॥ নেই—? তুমি কখন গিয়েছিলে?

সোনা ॥ তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। স্কুল থেকে বেরিয়ে যেতে যেতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। গিয়ে দেখি…কারখানার গেটে মিলিটারী পুলিস।

অসীমা ॥ মিলিটারী পুলিস…

সোনা ॥ কারখানার ধারে-কাছেও কাউকে যেতে দিচ্ছে না। রাস্তাঘাট সব ফাঁকা। দোকান-পাট বন্ধ। শুনলাম পুলিশের সঙ্গে নাকি কারখানার লোকদের খুব মারামারি হয়ে গেছে।

অসীমা ॥ মারামারি হয়ে গেছে!

সোনা ॥ ধর্মঘট ভাঙার জন্তে নাকি পুলিসের গাড়িতে করে লোক ঢোকানো হচ্ছিল কারখানায়। গেটে যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা টের পেয়েছে। অমনি গাড়ি আটকে দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিস মিলিটারী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

অসীমা ॥ তারপর ?

সোনা ॥ তারপর নাকি লাঠি গুলি টিয়ারগ্যাস চালিয়েছে…। অনেককে ধরে নিয়ে গেছে।

অসীমা ॥ কি সর্বনাশ !

সোনা ॥ এখন পুলিশ যাকে পাচ্ছে তাকে এ্যারেস্ট করছে।

অসীমা ॥ তোমার দাদাকে ধরেছে কিনা—

সোনা ॥ সেই খবরটাই তো জানতে পারলাম না।

অসীমা ॥ তাহলে ·· ?

সোনা ॥ দাদাকে পুলিস ধরতে পারবে না।

অসীমা ॥ কিছু অসম্ভব নয়…। ধরেছে কিনা তাও জানতে পারছি না।

সোনা ॥ সেবারের কথা মনে নেই। সেই খাদ্য আন্দোলনের সময় ! পুলিশ কত চেষ্টাই তো করলে ! পারলে ধরতে বড়দাকে।

অসীমা ॥ [আপন মনে] শুধু লুকোচুরি খেলা। জীবনের সঙ্গে, পুলিশের সঙ্গে, সারা জীবনভোর লুকোচুরি খেলা ! কাল খেলা !

সোনা ॥ কিন্তু পুলিশ যে রেহাই দেয় না মোটে।

অসীমা ॥ কিন্তু একবারও বাড়ী আসে নি…এমন তো কখনো ঘটেনি…

সোনা ॥ বাঃ, সেই বারেই তো ! মনে নেই ? সেই কতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকলেন বড়দা…মনে পড়ছে না ?

অসীমা ॥ থাকলেও ! একবার না একবার দেখা দিয়েই গেছে। যত রাতই হোক। খাইয়ে দিয়েছি। জামা-কাপড় বদলে দিয়েছি, এটা সেটা সঙ্গে দিয়েছি…তারপর চলে গিয়েছে…

সোনা ॥ এবার হয়তো সম্ভব হচ্ছে না। ধরা পড়লে যদি স্ট্রাইকের ক্ষতি হয়…

অসীমা ॥ ক্ষতি ! আমার ক্ষতির কথা কেউ ভেবেছে কখনও ? সংসারে হাজার ক্ষতির মধ্যে…কার কোনটা কতটুকু ক্ষতি কে বলে দেবে

ঠাকুরপো। তাও আজ আমি ভাবছি নে। শুধু ভাবছি…দু দুটো দিন চলে গেল…কাল সারাটা দিন…সমস্ত রাত…আজ সমস্ত দিন…সমস্ত বিকেল…সে মানুষের কোন খোঁজ নেই…আমার মনটা কিছুতেই ভাল বলছে না।

সোনা॥ আপনি মিথ্যেই বড় বেশী ভাবছেন বৌদি…। দেখবেন আজ রাত্রেই বড়দা ঠিক এসে যাবেন।

অসীমা॥ সবই দুরাশা…

সোনা॥ দেখবেন…ঠিক আসবেন!

অসীমা॥ আসা না আসা…তাওতো আজ পুলিসের হাতে। সেই লুকোচুরি খেলা!

সোনা॥ আমার মন বলছে…ঠিক আসবেন…অনেক রাত্রে আসবেন।

অসীমা॥ হ্যাঁ, দিনের আলোয় যাদের পথ চলা শেষ হল…রাতে অন্ধকারেই তো তাদের পথ খুঁজতে হবে। আর আমরা যারা সারা জীবন-ভোর পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম…তাদের জন্যে না এল কোন পথের আলো…না এল কোন পথের ডাক…তাদের পথ চলাই বন্ধ হল…

সোনা॥ আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বৌদি।

অসীমা॥ পারবে না ঠাকুরপো…। পথ যে আমাদের হারিয়ে গেছে। চল, হাতমুখ ধুয়ে নেবে। ও বেলার দু'টো ভাত ঢাকা দিয়ে রেখেছি… খেয়ে নেবে…

সোনা॥ ভাত! ভাত এল কি করে…

অসীমা॥ তোমার মতন 'দু'টো রেখে দিয়েছি। সেই কোন সকালে দু'টো খেয়ে স্কুলে গেছ…

সোনা॥ আমার খেতে ইচ্ছে করছে না বৌদি।

অসীমা॥ কেন…

সোনা॥ সত্যি বলছি…

অসীমা ॥ কেন...

সোনা ॥ আমি খাব না...আমায় খেতে বলবেন না বৌদি...

অসীমা ॥ কেন...

সোনা ॥ জানি না...

[প্রস্থানোদ্যত]

অসীমা ॥ ঠাকুরপো... [অসীমা বাধা দিলেন]

সোনা ॥ রোজ রোজ নিজে না খেয়ে খেয়ে আমার জন্যে রাখবেন···সে ভাত আমি খাব না···কিছুতেই না...

[কমলা প্রবেশ করলেন। বয়স পঞ্চাশের মধ্যে]

কমলা ॥ গল্প কর...গল্প কর...দেবর ভাজে মিলে দিনরাত গল্প কর। এত গল্প আসে কোথা থেকে...। বলি আর কাজ নেই বাড়ীতে। রাত হচ্ছে না? বলে দিলেই তো হয়·· হাড়ি চড়বে না, উনুন আর জ্বলবে না। যে যার পথ দেখে নাও...

অসীমা ॥ তার আমি কি জানি···

কমলা ॥ কে জানবে···

অসীমা ॥ সংসার কি আমার?

কমলা ॥ কার···

অসীমা ॥ সে আপনারা জানেন···

কমলা ॥ এ বেলায় আমরা জানব কেন? হেঁসেল কেড়ে নেবার বেলায় সে কথা মনে ছিল না কেন?

অসীমা ॥ সে আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবেন।

কমলা ॥ কি দরকার আমার! কে আমি এ সংসারের? আমি তো চোর। হেঁসেলের জিনিস চুরি করে বিক্কিরি করি···সংসার খরচের টাকা চুরি করে মেয়ে দিই, এই সব বলে আমার কাছ থেকে হেঁসেল কেড়ে নেওয়া হল। বলি এখন উনুন জ্বলছে না কেন? হাড়ি চড়ছে

না কেন না? এখন কে চুরি করছে? এতকাল সংসার চালিয়ে আমি হলাম গিয়ে চোর। ছেলেল কেড়ে নেওয়া হল! এখন রাত কত হল··· হিসেব নাও...

[গজ গজ করতে করতে ভিতরে চলে গেলেন কমলা]

সোনা ॥ বৌদি···

[অসীমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন]

এ বেলা বোধ হয় আর কিছুই নেই ঘরে···না···

[অসীমা তেমনই স্তব্ধ। নেপথ্যে সুকুমারবাবু। অনিলের বন্ধু]

সুকুমার ॥ সোনা—সোনা—

[সোনা দ্রুত দরজায় গেল]

নেপথ্যে সুকুমার ॥ কি খবর! অনিল এসেছে...

সোনা ॥ না—

[ভিতরে এলেন সুকুমারবাবু]

অসীমা ॥ আসুন সুকুমারবাবু···

সোনা ॥ বসুন... [একটা চেয়ার এগিয়ে দিলে]

সুকুমার ॥ কি খবর বৌদি···

অসীমা ॥ জানেন তো সবই। বসুন...

সুকুমার ॥ না। বসব না। রাত হয়ে গেছে···। আমাদের আবার মিছিল ছিল···অনিলদের স্ট্রাইকের সমর্থনে···ওদের কারখানার গেটের সামনে···। কিন্তু মিছিল তো যেতে দিল না। আমরা অনেকক্ষণ ডিমনস্ট্রেশন দিয়ে···এই মাত্র আসছি···অনিলের কোন খবর নেই?

অসীমা। না—

সুকুমার ॥ ওদের স্ট্রাইক মেটাবার তো এখনো কোন লক্ষণই দেখছিনে। তার ওপর যা পুলিস জুলুম শুরু হয়েছে···কোথায় যে এর শেষ কে জানে। ওদের ইউনিয়ন থেকেও কোন খবর দিয়ে যায়নি?

অসীমা॥ কাল এসেছিলেন একজন। তাঁরও কোন খোঁজ পাননি…

সুকুমার॥ এ তো বড় ভাবনার কথা হল। আজ সকালে তো পুলিস লাঠি চালিয়েছে…গুলি চালিয়েছে…। আশে পাশের দোকানগুলোকে তো ভেঙেচুরে চুরমার করে দিয়েছে…বাড়ির মধ্যে ঢুকে ঢুকে পর্যন্ত পুলিস ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছে…

[সবাই নিস্তব্ধ]

কিন্তু একটা খবর তো পাওয়া দরকার ছিল।

অসীমা॥ সত্যিই ছিল বুঝি—সুকুমারবাবু—

সুকুমার॥ [বিস্ময়ে] মানে—

অসীমা॥ মানে…আপনি তো আপনার বন্ধুরই মতন হবেন…তার বাইরে তো যেতে পারবেন না—

সুকুমার॥ [আরও বিস্ময়ে] মানে—

অসীমা॥ আপনি কি সত্যিই আপনার বন্ধুর জন্যে ভাবছেন?

সুকুমার॥ ভাবব না। আমরা একসঙ্গে পড়েছি…একসঙ্গে পাশ করেছি—চাকরীতে ঢুকেছি—আন্দোলন করি—

অসীমা॥ এই ভাবনার কথাগুলোই যদি আমি আপনার বন্ধুকে বলতাম—তাহলে তিনি বলতেন এই সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিও না। ওই সব ভাবাভাবির ব্যাপার লড়াইয়ের মধ্যে নেই। ও সব রান্নাঘরের ব্যাপার। আপনিও নিশ্চয়ই তাই বলবেন।

সুকুমার॥ সে এইসব বলে বুঝি!

অসীমা॥ অনেক কিছুই বলেন! কিন্তু এদিকে যে আমাদের, কি অবস্থা সে কথা একবারও মনে করেন না…

সুকুমার॥ তবে ব্যাপার কি জানেন…আন্দোলনের দায়িত্বে যারা থাকবেন…তাদের অনেকখানি আত্মত্যাগের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়। তার মধ্যে…

অসীমা ॥ আমাদের মতন সাধারণ মানুষের ভালমন্দর কোন মূল্যই নেই...

সুকুমার ॥ না, আমি ঠিক তা বলতে চাইছি না।

অসীমা ॥ আমি তো জানি আপনি কি বলবেন।

সুকুমার ॥ না। আমি কাউকে ছোট করে দেখার কথা বলছিনে...

অসীমা ॥ ওসব একই কথা। আপনারা মনে করেন লড়াই-টড়াইগুলো আপনাদের একারই ব্যাপার। আমরাও যে আছি···আমাদেরও যে একটা জীবন আছে···সংসারের সবকিছুর সঙ্গে যে আমাদের একটা সম্পর্ক আছে এই সহজ কথাটা আপনারা কখনও বোঝেন না আমাদেরও বুঝতে দেন না। মাঝখান থেকে ঘরে মধ্যে শুধু মার খেয়ে খেয়ে মরলাম আমরা।

[সবাই নিস্তব্ধ থাকবেন। ঘরের মধ্যে একটা থমথমে আবহাওয়া জমে উঠবে]

সুকুমার ॥ দেখুন···ব্যাপারটা ব্যক্তি সম্পর্কের...। আন্দোলনের সঙ্গে ব্যক্তির···ব্যক্তির সঙ্গে সংসারের, সমাজের—অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। এই মুহূর্তে তো আর কিছুই ভাবা যাচ্ছে না···

অসীমা ॥ এই মুহূর্তে আমিও আর কিছুই ভাবতে পারছি না সুকুমারবাবু···। সংসার নিয়ে, সংসারের খরচ-পত্তর নিয়ে···এতগুলো মানুষের খাওয়া পরা বাঁচা মরা নিয়ে···কি যে ভাবব···কিছুই বুঝতে পারছিনে। কেবলই মনে হচ্ছে···একটা ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মধ্যে আমি কেবলই ডুবে যাচ্ছি। কেবলই ডুবে যাচ্ছি···। কোথাও মাটি খুঁজে পাচ্ছিনে।

সুকুমার ॥ সংসারের টানাটানির মধ্যে এরকম মনে হওয়াটা অসম্ভব নয়···কিন্তু····

অসীমা ॥ কি বলবেন সে আমি জানি! এতো শুধু স্ট্রাইকের ব্যাপার বলে তো নয়...। এ সংসারে এসে অবধি দেখছি, অভাব···অভাব

আর অভাব! অভাব ছাড়া কোন ভাল কথা আমি কোনদিন শুনিনি…। আপনি আমার চেয়েও আরও বেশী জানেন...। অভাবের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছে…এ সংসারে আমার বেঁচে থাকার একটা দরজাও বুঝি খোলা নেই…

সুকুমার ॥ একদিন সব দরজা খুলে যাবে। দেখবেন সব বদলে যাবে। আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি…। ওদের ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি সর্বশেষ খবর নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি আসছি।

অসীমা ॥ কোন আপ্যায়নই আজ আপনাকে করতে পারলাম না সুকুমার বাবু…

সুকুমার ॥ তার কোন প্রয়োজন ছিল না—

অসীমা ॥ ছিল। কিন্তু পারছি না।

সুকুমার ॥ তাতে কি হয়েছে...

অসীমা ॥ হয়নি কিছুই। শুধু লজ্জা পেতেই ভুলে গেলাম।

সুকুমার ॥ আপনি আজ অত্যন্ত বিচলিত…

অসীমা ॥ না, আজই আমি সব চেয়ে সুস্থ। কেননা আজ অমি বুঝতে পারছি…আমি আজ কতখানি নেমেছি...

সুকুমার ॥ আচ্ছা…আমি আসি…

[চলে গেলেন। সোনা, অসীমা নীরবে থাকবেন কিছুক্ষণ]

সোনা ॥ বৌদি! [সোনা অসীমার সামনে আসবে]

অসীমা ॥ চল। অনেক দেরী হয়ে গেল...

সোনা ॥ আচ্ছা বৌদি! একটা কথা বলব…

অসীমা ॥ বল…

সোনা ॥ আপনার খুব কষ্ট, না— ?

অসীমা ॥ কতটা তা তো জানিনে—ভাই…

সোনা॥ আপনি অনেক জানেন কি না,—তাই বোধ হয় আপনার বড় কষ্ট···

অসীমা॥ না জানায় বুঝি কোন কষ্ট নেই···

সোনা॥ না।

অসীমা॥ কি করে বুঝলে ?

সোনা॥ আমি তো কিছু জানিনে···তাই আমার কোন কষ্ট নেই···

অসীমা॥ কে বললে তোমার কষ্ট নেই···

সোনা॥ আপনার মতন না—

অসীমা॥ জানার কষ্ট'র চেয়ে না জানার কষ্ট অনেক বেশী ঠাকুরপো। একটা পুড়িয়ে মারে···আর একটা তুষের আগুনের মতো ভিতরে ভিতরে দগ্ধ করে···। জানা অজানার তর্ক নিয়ে কি হবে জানিনে। শুধু এইটুকু জানি···যেটুকু জানলে সকলকে নিয়ে চলা যায়···সেই জানাটুকুই আজও আমার হয়নি। আর হয়নি বলেই তোমাদের সংসারে এসে না পেলাম সংসারকে···না পেলাম নিজেকে···মাঝখান থেকে নিজেকেই শুধু পুড়িয়ে মারলাম···। থাক, এসব কথা। রাত হয়ে গেল···। এসো···

[ভিতরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ভিতরে কমলার উচ্চকণ্ঠ শুনা গেল]

নেপথ্যে কমলা॥ যাক্···যাক্···সব উচ্ছনোয় যাক্···গোল্লায় যাক্··· যমের বাড়ি যাক্···আমার যারা সর্বনাশ করেছে···তারা নির্বংশ হোক···। সব চুরি করে নিয়েছে গো—খাইকুড়ে বাড়ী, হাড় হাবাতে বাড়ী···এমন বাড়ি ভুভারতে আছে ?

[সহসা ছুটে প্রবেশ করলেন]

বৌমা বৌমা আমার হরলিক্সের শিশিগুলো···

অসীমা॥ হরলিক্সের শিশি

কমলা ॥ আকাশ থেকে পড়লে যে···কিচ্ছু জান না যেন! চৌকির নীচে হরলিক্সের শিশিগুলো সাজানো ছিল···কোথায় গেল···

অসীমা ॥ তার আমি কি জানি...

কমলা ॥ জানি না মানে···হাত পা গজিয়ে ঘর থেকে আকাশে উড়ে গেল···

অসীমা ॥ সে আপনি জানেন...

কমলা ॥ তুমি জান না—

অসীমা ॥ শিশি বোতলের হিসেব রাখার দরকার আমার কোন দিনই হয়নি·· আজও দরকার নেই...

কমলা ॥ তুমি বড় ঘরের মেয়ে···তোমার দরকার না থাকতে পারে···। আমার আছে।

অসীমা ॥ তা দেখবে কেন? আমি কত কষ্টে এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে নিয়ে···জমিয়ে জমিয়ে রেখেছি...দু'টো পয়সা করব বলে কম করেও তিন চার টাকার জিনিস...সব নিকেশ করলে গা···। একটা পয়সা হাতে ধরে দেবার কারুর মুরোদ নেই...শত্রুতা করবার বেলায় আছে চোদ্দজনা? মর মর সব শত্তুর মুদ্দোর দল... মর মর...

[যেমন এসেছিলেন তেমনি ছুটে চলে গেলেন। সবাই স্তব্ধ]

সোনা ॥ আপনি জানেন বৌদি...হরলিক্সের শিশিগুলো কি হল! এই নিয়ে তো মা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে।

অসীমা ॥ [নিথর কণ্ঠে] না—

সোনা ॥ আমি দেখি কি হল...

[দ্রুত ভিতরে চলে গেল। কমলার কণ্ঠ তখনও ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছিল। অসীমা অবসন্নের মতো একটা টুলের ওপর বসে পড়ল। হাতদুটো কোলের ওপর মুঠো করে চোখ বুজল]

অসীমা ॥ সব অন্ধকার হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে একে একে সব আলো নিভে যাচ্ছে...অন্ধকার...কি অন্ধকার...

[বাইরে থেকে অতি দ্রুত প্রবেশ করলেন বাড়ির কর্তা। বয়স ষাটের মধ্যে। বেশ বাস দরিদ্রের। হাতে একটা লাঠি]

কর্তা ॥ এই যে বৌমা···

[কর্তা প্রবেশ করতেই অসীমা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিল]

বড় খোকা বাড়ি এসেছে···

অসীমা ॥ না—

কর্তা ॥ এখনও আসেনি···

[নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর অতি ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। একটু গিয়ে থামলেন]

এখনও এল না...[থামলেন] কোন খবর...

অসীমা ॥ না—

কর্তা ॥ খবর হয় তো একটা তৈরী হচ্ছে...কিংবা হয়ে গেছে...শুধু আমাদের কাছেই এখনও আসেনি...কিংবা হয়ত আসছে...বা আদৌ নাও আসতে পারে...

অসীমা ॥ [ভয়ে, বিস্ময়ে]...কি বললেন...

কর্তা ॥ নাঃ! কিছু না! বলছিলাম...না কিছু বলছি না...

অসীমা ॥ আপনি কি কিছু...

কর্তা ॥ না···আমি কিছু জানি না···আমি কিছু জানি না···। রাজনীতি একটা ভয়ানক ব্যাপার কি না। আর রাজনৈতিক শত্রুতা সে যে কি সাংঘাতিক···কোন পর্যায়ে যায়···সে অতি ভয়ঙ্কর···অতি ভয়ঙ্কর···

[একটা আতঙ্ক তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল]

কিন্তু বড় খোকা এখনও এল না···এল না...

[যেন নিরাশায় ক্লান্ত হয়ে পড়বেন]

অসীমা ॥ রাজনীতি আমি বুঝিনে বাবা...। সে আপনি বোঝেন... আপনার ছেলে বোঝে। আপনাদের তর্ক শুনে শুনে আমি শুধু এইটুকুই বুঝেছি যে আসলে রাজনীতিই একটা শত্রুতা...

কর্তা ॥ ঠিক—। ঠিক বলেছ—

অসীমা ॥ আপনি আপনার ছেলের শত্রু...

কর্তা ॥ [চমকে] এ্যাঃ !

অসীমা ॥ আপনার ছেলে আপনার শত্রু...

কর্তা ॥ শত্রু ! নাঃ ! হ্যাঁ ! তা তা বলা যেতে পারে...একটা স্বার্থের... শত্রু। একটা...একটা...ভয়ঙ্কর স্বার্থ...যার জন্যে...যার জন্যে আমি বড় খোকাদের সমর্থন করি না...। আমি তাদের বিরোধিতা করি... আমার করা উচিত...আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে করা উচিত···এবং আমি তা করব। কেননা ধর্মঘট, বিশৃঙ্খলা, মারামারি...হিংসা...রক্তপাত এসব নয়...মানুষের শুভবুদ্ধি হৃদয়ের পরিবর্তনই...মূল শক্তি, যা মানুষের কল্যাণ...যা সুন্দরকে আনতে পারে...! কিন্তু বড় খোকা এখনও এলো না কেন...এখনও এলো না...এলো না...! সেজ বৌ... সেজ বৌ...সেজ বৌ...

[কমলা প্রবেশ করবে]

কমলা ॥ কি, কি বলছ...

কর্তা ॥ আমি যে কাজটা করছিলাম না কিছুদিন ধরে···আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি...

কমলা ॥ বেশ করেছ...শুকিয়ে মরার দরজাটা ভাল করে খুলে দিয়ে এসেছো···। এখন এস···

কর্তা ॥ ভুল করলাম নাকি !

কমলা ॥ কি হল এখনই টের পাবে...এস...

কর্তা ॥ ভুল করলাম নাকি···ভুল করলাম নাকি

[দুজনে চলে গেলেন। এমন সময় বাইরে থেকে সোনার বন্ধু তপন প্রবেশ করবে]

তপন ॥ বৌদি—

অসীমা ॥ তপন...এসো ভাই...

তপন ॥ তিন টাকা হল...বৌদি...

অসীমা ॥ অতগুলো হরলিক্সের শিশি···এতগুলো খবরের কাগজ...

তপন ॥ নিতে চায় না তো। খবরের কাগজগুলো নিল। হরলিকসের শিশিগুলো নিতে চায় না। বলে কি···শিশি বোতল যারা কেনে... তাদের কাছে দিও...আমাদের মুদিখানার দোকানে ঠোঙার কাগজের দরকার। শিশি বোতল কি করব... । তা আমি খুব করে বলাতে... শেষে নিল।

[সহসা সোনা প্রবেশ করল]

সোনা ॥ বৌদি...হরলিক্সের শিশিগুলো সত্যিই নেই···

অসীমা ॥ নেই...

সোনা ॥ না—। কে সত্যিই চুরি করে নিয়েছে।

অসীমা ॥ তাই তো... । আচ্ছা ঠাকুরপো···তুমি একটু তপনের সঙ্গে কথা বলো। আমি আসছি—

[দ্রুত প্রস্থান]

সোনা ॥ তপন···তোর বই সব কেনা হয়ে গেছেরে!

তপন ॥ না, রে!

সোনা ॥ কিনবি—

তপন ॥ হাফ দামে পেলে নিতাম...

সোনা ॥ এক্ষুণি নিবি।

তপন ॥ নোব—

সোনা ॥ দাঁড়া— [কতকগুলো বই এনে টেবিলে রাখল]
কোনটা কোনটা লাগবে...দেখতো...

তপন ॥ তোর বই বিক্রি করবি...

সোনা ॥ দেখ না—

তপন ॥ না—

সোনা ॥ নে···না

তপন ॥ না—

সোনা ॥ আমি আর পড়ব না রে...

তপন ॥ কেন—

সোনা ॥ পড়তে পারি নে...

তপন ॥ কেন—

সোনা ॥ সত্যিই পড়তে পারি নে·· মন বসে না···

তপন ॥ মন দিয়ে পড়...ঠিক হবে...

সোনা ॥ কিছুতেই মন বসে না রে। যতই জোর করে পড়তে বসি··· লেখাগুলো হারিয়ে হারিয়ে যায়...আর কেবলই মনে হয়...কারা যেন আমার বুকের মধ্যে বসে একটা সোনার হার তৈরী করছে...কবলই তৈরী করছে।

তপন ॥ সোনার হার।

সোনা ॥ বৌদি তার হার বিক্রী করে আমার স্কুলের মাইনে শোধ করেছিলেন, আমার বই কিনে দিয়েছিলেন···সেই থেকে পড়তে বসলেই...আমার বুকের মধ্যে কে যেন হার তৈরী করতে বসে—আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—পড়তে পারি নে—নে না বইগুলো...কটা টাকা আমার দে...

তপন ॥ দাঁড়া—টাকাটা নিয়ে আসি—

[দ্রুত চলে গেল। অসীমা প্রবেশ করলেন হাতে একটা ব্যাগ]

অসীমা॥ ঠাকুর পো—রাত তো খুব বেশী হয় নি, যদি পার তাড়াতাড়ি গিয়ে যা হয় কিছু কিনে নিয়ে এসো—রান্না চড়াবো। তুমি এলে উনুনে আঁচ দোব—। এই টাকা কটা রাখ—

[ব্যাগ ও টাকা অসীমা সোনার হাতের মধ্যে গুঁজে দিলেন]

সোনা॥ আমি আর পড়ব না বৌদি—

অসীমা॥ কি—

সোনা॥ আমি আর স্কুলে যাব না—

অসীমা॥ তোমার দাদা এলে জিজ্ঞাসা করো—

সোনা॥ আমি কারুর কথা শুনবো না—

অসীমা॥ তোমার দাদার ইচ্ছে তুমি বড় হবে—

সোনা॥ আমি বড় হব না—

অসীমা॥ তোমাকে অনেক বড় হতে হবে—

সোনা॥ আমি স্কুলের বই পড়ব না। আমি সেই বই পড়ব…যাতে লেখা আছে…বাঁচার কথা—কেমন করে মানুষ বেঁচে আছে, তার কথা—

[সহসা বইগুলো তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছিল]

অসীমা॥ কোথায় যাচ্ছ—

সোনা॥ তপনকে বইগুলো—

অসীমা॥ না— [সোনার হাত থেকে বইগুলো কেড়ে নিতে লাগলেন। সোনা জোর করতে থাকল]

সোনা॥ না—আমি আর পড়ব না—

অসীমা॥ কি হচ্ছে কি—

সোনা॥ না— [বইগুলো ছিটিয়ে পড়ে গেল। অসীমা বইগুলো তুলতে লাগলেন]

অসীমা ॥ না—। বেঁচে থাকার দরজাগুলোকে এমনি করে করে বন্ধ হতে দোব না—

[তপন এসে পড়ল]

তপন ॥ কি হয়েছে—

অসীমা ॥ না, কিছু না—

তপন ॥ এই নে, টাকা—সোনা—

[সোনার হাতে টাকা দিল। অসীমার হাত থেকে বইগুলো নিয়ে টেবিলের ওপর গুছিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল]

সোনা ॥ নিবি নে বই ?

তপন ॥ না—

সোনা ॥ তপন—

তপন ॥ মা বললেন—তুই আর আমি এক বই দেখেই পড়ব।

[চলে গেল। কমলা প্রবেশ করলেন]

কমলা ॥ বৌমা—বড় খোকা বাড়ি এলে—আমার সুদের টাকাটা চেয়ে দিও।

[বলেই চলে যাচ্ছিলেন]

অসীমা ॥ আপনার সুদের টাকা আপনি চাইবেন…আমি চাইব কেন ?

কমলা ॥ বলি টাকাটা তো আর আমার নয়।

অসীমা ॥ কিন্তু আমি তো আর সুদের কারবার করি নে…

কমলা ॥ এসব কথা বললে তারা শুনবে কেন ?

অসীমা ॥ সে আপনি বুঝবেন আর তারা বুঝবেন…

কমলা ॥ টাকা ধার দিয়ে কি তারা চোর দায়ে ধরা পড়েছে…?

অসীমা ॥ যত ধরা পড়েছে আপনার ছেলে…

কমলা ॥ ধার নিলেই ধরা পড়তে হয়।

অসীমা ॥ নিজের জন্তে নিয়েছে ?

কমলা ॥ সে জেনে আমার লাভ ?

অসীমা ॥ ছেলে যে ক'দিন বাড়ি আসেনি সে খোঁজের দরকার নেই··· খোঁজ পড়েছে সুদের টাকার···

কমলা ॥ খোঁজ নেবার লোক যখন রয়েছে বাড়িতে··· আমাদের আর দরকার কি ! আমরা তো এখন পর···

অসীমা। ছেলের সঙ্গে সঙ্গে সুদের কারবার করলে ছেলে পরই হয়···

কমলা ॥ কি বল্লে···

অসীমা ॥ অপরের নাম করে ছেলের কাছে সুদে টাকা খাটান...আমরা কেউ জানি না—না। কিচ্ছু করব না···কিচ্ছু করব না এই পাপ সংসারের জন্তে—। দাও তো ঠাকুরপো, দাও তো টাকা কটা— [সোনার হাত থেকে টাকা ও ব্যাগ নিয়ে ঝড়ের বেগে ভিতরে চলে গেলেন]

কমলা ॥ পাপ সংসার ! কার পাপ ! কার পাপে পুড়ছে সংসার শুনি...। বুকে করে যে ছেলেকে মানুষ করিছি—সাধ করে বিয়ে দিইচি···সেই ছেলেকে পর করলে। সংসারটাকে কেড়ে নিলে পর্যন্ত আমার হাত থেকে···,কোলের ছেলেটাকে পর্যন্ত বশ করে নিলে—কার পাপে পুড়ছে সংসার—পোড়ারমুখী—। হয়েছে কি—আরও পুড়বে —সোনার লঙ্কায় আগুন ধরেছে—ছারখার হবে—

সোনা ॥ [চীৎকার করে] মা—

[সোনা কমলার সামনে এসে দাঁড়াল। কমলা চেয়ে দেখলেন ছেলেকে]

মা—! সোনা বলে একটা ছেলে ছিল—সে একদিন স্বপ্ন দেখেছিল—। চারিদিকে ফুল ফুটেছে, গোলাপ, গোলাপ—সাদা—লাল—কত রং। যেই একটা ফুলে হাত দিতে গেছে—অমি ফুলটা সাপ হয়ে গেল—।

সমস্ত ফুল সাপ হয়ে গেল। সে পালাতে গেল—। যেখানেই পা ফেলে সেখানেই সাপ—। চীৎকার করল—। গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলো—জানলার পাশে একটা সূর্যমুখী ফুটে আছে—। অন্ধকারের সেই সূর্যমুখীটাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না মা—কিছুতেই ভুলতে পারছি না—

[বলতে বলতে ভিতরে চলে গেল]

কমলা ॥ আমার সব পুড়ে গেল—। চোখের সামনে একে একে সব পুড়ে যাচ্ছে। যাক! যাক! দেখবো—আগুন কত দূর ওঠে—কিচ্ছু দেখবো না। চোখ বুজে থাকবো। সব মরুক, পুড়ুক—ছাই হোক—

[প্রস্থানোদ্যত]।

[এমন সময় হুদ্দাড় বেগে ঢুকল বিমল ও তার বন্ধু হীরেন। বয়েস তিরিশের মধ্যে। চোঙা প্যান্ট ও লম্বা জুতো দুপায়ে। দুজনের মুখেই সিগারেট]

বিমল ॥ এই যে, মা—আমার বন্ধু হীরেন—জাহাজে কাজ করে—কিছু টাকা ধার চায়—[জোরে জোরে সিগারেট খায়]

কমলা ॥ টাকা নেই।

[চলে যাচ্ছিলেন কমলা]

বিমল ॥ মা, শোন—খুব দরকার। ও তো নানান দেশ ঘুরে বেড়ায়। ঘড়ি, পেন, রেডিও এন্তার হাপিস্ করে। আর কলকাতায় এসে ঝেড়ে দেয়...। কি টাকাটাই না মারে। আমাকে বলেছে—দেবে। ব্ল্যাকে ঝাড়ব—হাফ হাফ শেয়ার—। মা তুমিও যদি ব্ল্যাকে ঝাড়তে পার না—হাফ হাফ মারবে—ক্লিয়ার।

কমলা ॥ কত চাই—

হীরেন ॥ এক শো—

কমলা ॥ পঞ্চাশ দেব—

হীরেন ॥ তা কি করে হয়—

কমলা ॥ নিও না— [কমলা দ্রুত যাচ্ছিল]

হীরেন ॥ আচ্ছা—রাজী !

কমলা ॥ কি আছে—

হীরেন ॥ ঘড়ি—

কমলা ॥ [একটু চেয়ে থেকে] দেখি—

[হীরেন ঘড়িটা দিল। কমলা দেখতে লাগল]

কোথাকার—

হীরেন ॥ খাস সুইডেনের—

কমলা ॥ আপাততঃ বন্ধক থাকবে। টাকা শোধ হলে ফেরৎ !

হীরেন ॥ অল রাইট্—

কমলা ॥ মেয়াদ—

হীরেন ॥ এক মাস—

কমলা ॥ সুদ কিন্তু চড়া—

হীরেন ॥ গুলি মার !

কমলা ॥ খোকা, ভিতরে আয়—

[কমলার প্রস্থান]

হীরেন ॥ কি থাবাজ মাগীরে—

বিমল ॥ [গর্জন করে] এ্যাই—

হীরেন ॥ লরি সিগারেট নে—

[বিমল ভিতরে গেল। বাইরে থেকে এল সুনীল। বয়স তিরিশের মতন]

হীরেন ॥ কি চাই—

সুনীল ॥ আপনি কে।

হীরেন ॥ আমি বিমলের বন্ধু—

সুনীল ॥ আমি বিমলের বড় ভাই—

হীরেন ॥ সরি—। সিগারেট নিন্—

সুনীল ॥ স্কাউণ্ড্রেল—

[ভিতরে চলে যাচ্ছিল, বিমল ফিরে এল]

বিমল ॥ এই মেজদা—একটা টাকা ছাড়বি—

সুনীল ॥ গাছের ফল [চলে গেলেন]

বিমল । শালা—

ছেলেটি ॥ মাইরি তোর এই দাদাটি না, ল্যাভেণ্ডিস মার্কা—

বিমল ॥ [গর্জন করে] এ্যাই !

ছেলেটি ॥ সরি ! সিগারেট নে—

বিমল ॥ এই নে টাকা। ক্লিয়ার !

[ছেলেটি টাকা পকেটে পুরল]

ছেলেটি ॥ তোর মা মাইরি সাইলক দি জু !

বিমল ॥ মূর্খ মা চিনলি নে—। এই দেখ— [ঘড়িটা দেখাল]

ছেলেটি ॥ তোর কাছে ?

বিমল ॥ [সিগারেট টানতে টানতে] বেঁচতে দিল—

ছেলেটি ॥ বেচতে—

বিমল ॥ তবে কি ঘরে পুষবে নাকি ? এর থেকে আমারও কিছু হয়ে যাবে—হাফ—হাফ ক্লিয়ার !

ছেলেটি ॥ বেচে দিবি। তুই যে বললি—টাকা ধার কর—ঘোড়া খেলবো।

বিমল ॥ ঘোড়াই তো খেলছি রে—দেখছিস নে বুকের পাঁজরার ওপর দিয়ে ঠকা ঠক্ ঠকা ঠক্ ঘোড়া ছুটে চলেছে।

ছেলেটি ॥ আমার ঘড়ি ফেরৎ দে—

বিমল ॥ চাল ফেরৎ নেই—। ঘোড়াগুলো এখন বাঘের মতন খেলছে।

ছেলেটি ॥ জোচ্চোর—

বিমল ॥ সারা দুনিয়াটাই ঘোড়া হয়ে গেল—আর তুই আমি তো গাধারে।

ছেলেটি ॥ দিবি নে—

বিমল ॥ ভাগ—শালা—

ছেলেটি ॥ দেখে নেবো—এক মাঘে শীত যায় না।

বিমল ॥ শালা ভাগ আগে—। [ধাক্কা দিল]

ছেলেটি ॥ আচ্ছা— [প্রস্থান]

বিমল ॥ শালা বিমল চন্দরকে মাঘ মাস দেখাচ্ছে—হুস্!

[বিমল সহসা বাক্স প্যাটরাগুলো খুলতে থাকে একটার পর একটা। কি যেন খুঁজতে থাকে। অসীমা হঠাৎ প্রবেশ করে]

অসীমা ॥ কি নিচ্ছ—ঠাকুর পো।

বিমল ॥ খবরের কাগজটা কোথায় গেল—

অসীমা ॥ খবরের কাগজ বাক্সের মধ্যে থাকে।

বিমল ॥ দেখছিলাম খুঁজে—

অসীমা ॥ মিথ্যে কথা,—চুরি করছিলে!

বিমল ॥ খবরদার বৌদি—

অসীমা ॥ চোর! একটার পর একটা আমার সমস্ত জিনিস চুরি করেছো—

বিমল ॥ ফের—বলছো—

অসীমা ॥ একশোবার বলব। টাকা চুরি করেছো—গয়না চুরি করেছো—সর্বস্ব নিয়েছো—

বিমল ॥ মা—[চীৎকার করল] শুনছো—

অসীমা ॥ [ছুটে গিয়ে বাক্স হাতড়াতে থাকবে] দেখি—দেখি—আমার সোনা বাঁধানো লোহাটা—আমার সেই সোনা বাধানো লোহাটা—

[ক্রুদ্ধ চোখে বিমলের দিকে চেয়ে]

দাও—দাও বলছি—

[কমলা, সুনীল, সোনা প্রবেশ করবে]

বিমল ॥ কে নিয়েছে—

কমলা ॥ কি হল—কি—

অসীমা ॥ দাও বলছি—আমার বিয়ের আশীর্বাদী লোহা—দাও…দাও—

বিমল ॥ ফের ফের বলছো—

অসীমা ॥ দাও—নইলে এ সংসার আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছার খার করে দোব—

বোমা ॥ ছারে খারেই যাবে—কি হয়েছে কি ?

অসীমা ॥ ঠাকুর পো আমার সোনা বাঁধানো লোহাটা চুরি করে নিয়েছে—

বিমল ॥ মিথ্যে কথা—

অসীমা ॥ আমি নিজের চোখে দেখিছি—

বিমল ॥ আমি খবরের কাগজ খুঁজছিলাম—

অসীমা ॥ চোর—মিথ্যেবাদী কোথাকার

কমলা ॥ বৌমা—মুখ সামলে কথা বলো—আমার ছেলের নামে দোষ দিলে আমি কুরুক্ষেত্তর কোরব !

অসীমা ॥ একশো বার বলব—হাজার বার বলব।

কমলা ॥ আর তুমি যে হরলিক্সের শিশিগুলো বেচে দিয়ে পয়সাগুলো মেরে দিলে—

অসীমা ॥ মিথ্যে কথা—

কমলা ॥ খবরের কাগজগুলো বিক্রি করে করে পয়সাগুলো মেরে দাও না ?

অসীমা ॥ না—

কমলা ॥ তুমি না নিলে কি—বাইরের থেকে লোক এসেছে নিতে—

সোনা ॥ [চীৎকার করে] মা—

কমলা ॥ তুই চুপ কর।

সোনা ॥ না—

বিমল ॥ মায়ের মুখের ওপর কথা বললে মুখ দিয়ে রক্ত বের করে দোব হারামজাদা—

অসীমা ॥ খবরদার ঠাকুর পো—

বিমল ॥ আমার ভাইকে শাসন করব—আপনি বলবার কে ?

অসীমা ॥ চোর জোচ্চোররা শাসন করবে ?

বিমল ॥ ফের বললে গলা টিপে শেষ করে দোব—এখেনে—

অসীমা ॥ [আর্তনাদ করে উঠল] কি বললে—

[সবাই স্তব্ধ। সোনা ক্রুদ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বিমলের দিকে চেয়ে আছে]

কমলা ॥ চল খোকা—ভিতরে চল। বিদ্বান বৌ, ছোট ঘরে এসেছে—সেই তো এখন শাসনকর্তা হবে। তোরা কে···তোরা তো তার নফর বান্দা···আমরা দাসদাসী···চল···

[সবাই চলে গেল। সোনা অসীমার কাছে এসে দাঁড়াল]

সোনা ॥ আপনি কিছু মনে করবেন না বৌদি···

অসীমা ॥ মন বলতে আর আমার কিছুই নেই ঠাকুর পো—

সোনা ॥ আমি যদি কোন মন্ত্র জানতাম···তাহলে···এক্ষুনি মানুষের মন থেকে সমস্ত বিষ নামিয়ে নিতাম !

অসীমা ॥ বিষ !

সোনা ॥ কিন্তু আমি কিচ্ছু জানি না···কিচ্ছু জানি না···

অসীমা ॥ বিষ আমার সর্বাঙ্গে—বিষের জ্বালায় দেহ মন নীল হয়ে গেল—ঠাকুর পো—

সোনা ॥ আমি কি করব বৌদি—

অসীমা ॥ আমিও তাই ভাবছি কি করব আমি। কি করব আমি—সব অন্ধকার—সব অন্ধকার হয়ে আসছে—

নেপথ্যে ॥ কে আছেন—

[সোনা দ্রুত দরজায় গেল]

সোনা ॥ আসুন—

[সোনা একজন ধর্মঘটী শ্রমিককে ভিতরে নিয়ে এল]

ব্যক্তিটি ॥ অনিলবাবুকে আমরা এখনও খুঁজে পাইনি—। আমাদের সবাই—আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। সকালের মারপিটের আগে থেকেই তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কোন খবর এসে যায়—যত রাতই হোক দিয়ে যাব। আচ্ছা আসি—

[ব্যক্তিটি চলে যাবেন]

অসীমা ॥ রাত কত হল ঠাকুর পো—

সোনা ॥ বড়দার আসার সময় হয়ে এসেছে বৌদি—

অসীমা ॥ আমারও সময় হয়ে আসছে ঠাকুর পো—

সোনা ॥ বৌদি—

[ভিতর থেকে এলেন কর্তা]

কর্তা ॥ বৌমা—বৌমা—আমি ভুল করিনি, আমি ঠিক করেছি—আমি চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছি—কিন্তু—কিন্তু—বড় খোকাতো এখনও এলো না—এখনও এলো না—এলো না—

সোনা ॥ বড়দা হয়ত অনেক রাত্রে আসবেন বাবা—

কর্তা ॥ অনেক রাত্রি—। আমি জেগে থাকবো—আমি জেগে থাকবো—। জান বৌমা—আমি চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে এসেছি বলে—তোমার শাশুড়ী আমাকে খেতে দেয়নি পর্যন্ত—ছেলেদের পর্যন্ত বারণ করে দিয়েছে কিছু দিতে। আমাকে—আমাকে নাকি একাই চলতে হবে কিন্তু আমি একবার শেষবারের মতন জিজ্ঞাসা করবো,—জেনে নোব [চীৎকার করে ডাকলেন]—সেজ বৌ, বিমল, সেজ বৌ—সুনীল সবাই এসো—সবাই—সবাই— [সবাই এলেন]

সেজ বৌ ॥ চেঁচাচ্ছ কেন—চেঁচাচ্ছ কেন—
মরণ দশায় ধরেছে নাকি, কি হয়েছে কি— ?

সুনীল ॥ কি ব্যাপার কি—চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছেন কেন রাত দুপুরে—? লোকে শুনলে বলবে কি— ?

সেজ বৌ ॥ হবে আবার কি ! শেষ দশা !

বিমল ॥ খাটে তোলার অবস্থা আরকি !

কর্তা ॥ এ সংসারের দায়িত্ব কার ?

সুনীল ॥ কারুরই না—

কর্তা ॥ তাহলে সংসার চলবে কি করে—

সুনীল ॥ যে যার পথ দেখে নিক—এর আর বলবার কি আছে ? [প্রস্থান]

কর্তা ॥ সেজ বৌ—

কমলা ॥ আমার কি দায় ঠেকেছে—। আমার পথ আমি ঠিক করে নোব—। দুবেলা দুটো খাওয়া তার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিতে পারব। কারুর ভাবতে হবে না। [প্রস্থান]

বিমল ॥ আমি আমারটা ঠিক ম্যানেজ করে নোব—তোমরা তোমাদেরটা দেখ—ক্লিয়ার ! [প্রস্থান]

কর্তা ॥ সোনা !

সোনা ॥ বাবা !

[একটু নীরব থেকে]

আমি কিছুতেই সেই সূর্যমুখী ফুলটার কথা ভুলতে পারিনে—। আমি খুঁজে দেখবো বাবা কোথায় সেই সূর্যমুখী ফুলটা আছে—আমি খুঁজে দেখবো—খুঁজে দেখবো— [চলে গেল]

কর্তা ॥ সব মিথ্যে—সব মিথ্যে—আমি মিথ্যে—সংসার মিথ্যে—সমস্ত সম্পর্ক মিথ্যে—আমরা একা—একা—একা—

[ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন]

আমরা সবাই আজ কর্ণ! আমাদের রথের চাকা কখন যে মেদিনী গ্রাস করেছে—আমরা টেরও পাইনি—। আমাদের কবচ কুণ্ডল নিয়তি কখন চুরি করে নিয়ে গেছে আমরা কেউ জানিনে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে এখন আমরা একা—

নেপথ্যে ॥ যজ্ঞেশ্বরবাবু বাড়ি আছেন—

কর্তা ॥ [চমকে উঠলেন] কে! [উঠে দাঁড়ান]

নেপথ্যে ॥ যজ্ঞেশ্বরবাবু বাড়ি আছেন—

[একটি বিশ্রী দর্শন লোক এল ভিতরে]

লোকটি ॥ এই যে আপনাকে এক্ষুণি যেতে হবে।

কর্তা ॥ আমি পারব না—

লোকটি ॥ আপনি হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন—

কর্তা ॥ আমার ইচ্ছে—

লোকটি ॥ যখন নিয়েছিলেন তখন ভাবা উচিত ছিল—

কর্তা ॥ তখন জানতাম না।

লোকটি ॥ কি জানতেন না।

কর্তা ॥ এই সব কাজ করতে হবে—আমি জানতাম না।

লোকটি ॥ এইসব কাজ কি আপনি নতুন করছেন—

কর্তা ॥ গুণ্ডা পোষা পাটির কাজ আমি করবো না…

লোকটি ॥ এতদিন তো গুণ্ডা পোষা পার্টি হয়নি—। আজ যেই আপনার ছেলের কারখানায় গুণ্ডা পাঠাতে হয়েছে—অমনি গুণ্ডা পোষা পার্টি হয়ে গেল—আপনি যাবেন কিনা। আজ সমস্ত রাত আপনাকে ওখানে থাকতে হবে—কয়েকটা কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়েছে—সেখানে লোক পাঠাতে হবে—

কর্তা ॥ আমি পারব না—

লোকটি ॥ আপনি কিন্তু পার্টির ক্ষতি করছেন—

কর্তা ॥ হোক—

লোকটি ॥ এই আপনার শেষ কথা—

কর্তা ॥ হ্যাঁ—

লোকটি ॥ ভেবে দেখুন—। আপনার ক্ষতি হবে—

কর্তা ॥ হোক—

লোকটি ॥ আচ্ছা— [চলে গেল। কর্তা ধীরে ধীরে অবসন্নের মতো চেয়ারে বসে পড়লেন)

অসীমা ॥ আপনি গুণ্ডা পাঠিয়েছিলেন। আপনার ছেলের ধর্মঘট ভাঙবার জন্যে—

কর্তা ॥ আমি রাজনীতি করেছি—

অসীমা ॥ আপনি আপনার ছেলের শত্রু—

কর্তা ॥ কে নয়? তুমি নও—

অসীমা ॥ আমি!

কর্তা ॥ তুমি আরও শত্রু? তুমি তাকে সাহায্য করনি কেন? কেন করনি?

অসীমা ॥ আমি, আমি—

কর্তা ॥ তুমি চাওনি। কেন চাওনি?

অসীমা ॥ আমি! আমার মন চায়নি—

কর্তা ॥ তুমিও তার শত্রুতা করেছ। তুমিও শত্রু—

অসীমা ॥ শত্রু!

কর্তা ॥ আমি গুণ্ডা পাঠিয়ে শত্রুতা করেছি—তুমি তাকে না সাহায্য করে শত্রুতা করেছ—আমরা সবাই শত্রু—

অসীমা ॥ শত্রু!

কর্তা ॥ আমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। আমরা কেউ কারুর নই। একা।

অসীমা ॥ একা!

কর্তা ।। একা। তুমি একা, আমি একা, সবাই একা, আমাদের কারুর সঙ্গে কারুর কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক ভেঙে গেছে, হারিয়ে গেছে—মরে গেছে—। এখন মৃত্যু—

অসীমা ।। মৃত্যু—

কর্তা ।। মৃত্যুর কাজ শুরু হয়েছে। ভিতরে বাইরে যখনই একা হয়ে গেছি—তখনই মৃত্যুর কাজ শুরু হয়েছে! শূন্যতাই মৃত্যু!

অসীমা ।। মৃত্যু—

কর্তা ।। বড় খোকার শত্রুতা করব বলেই রাজনীতি করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাজনৈতিক শত্রুতা যে কি সাংঘাতিক—কি ভয়ঙ্কর—সেই মুহূর্তেই আমার কল্যাণ মরে গেল [থামলেন] আমার সুন্দর মরে গেল। আমিই শুধু নিঃশেষ হয়ে গেলাম। একটা হাউইয়ের মতন জ্বলে ওপরে ওঠে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলাম। আমার মৃত্যুর ছাই আমার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। মৃত্যুর মাঝখানে আমিই শুধু একা বড় খোকা—[উঠে ভিতরের দিকে চলতে শুরু করলেন] কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকার। বড় খোকা কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি একা। দরজা কোথায়? দরজা? বড় খোকা—দরজা কোন দিকে—দরজা—বড় খোকা—বড় খোকা—[বলতে বলতে চলে গেলেন, অসীমা ভাবতে লাগলেন।]

অসীমার মন ।। মৃত্যুর ছাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—

অসীমা ।। মৃত্যু!

অসীমার মন ।। মৃত্যুর মাঝে আমরা সবাই একা—

অসীমা ।। মৃত্যু—।

অসীমার মন ।। মৃত্যুই সব—

অসীমা ।। না—

অসীমার মন ।। তুমি মৃত—

অসীমা ॥ না—

অসীমার মন ॥ তুমি বহু যুগ থেকে মৃত—

অসীমা ॥ না, আমি বেঁচে আছি।

অসীমার মন ॥ তুমি অন্যায়ভাবে বেঁচে আছ—

অসীমা ॥ না—

অসীমার মন ॥ তুমি একা একা বেঁচে আছ—

অসীমা। না—

অসীমার মন ॥ তুমি একা—

অসীমা ॥ না—

অসীমার মন ॥ তোমার সঙ্গে কারুর সম্পর্ক নেই—

অসীমা ॥ না, আমার স্বামী আছে, সংসার আছে—

অসীমার মন ॥ তোমার স্বামী নেই—

অসীমা ॥ মিথ্যে কথা—

দূরের অনিল ॥ অসীমা—

অসীমা ॥ বল—

দূরের অনিল। একদিন তোমার বিয়ে হয়েছিল—

অসীমা ॥ তুমি আমার স্বামী—

দূরের অনিল ॥ তুমি আমি আজ বিচ্ছিন্ন—

অসীমা ॥ আমায় আপন করে নিলে না কেন—

দূরের অনিল। তুমিই তোমাকে পেতে দিলে না কেন?

অসীমা ॥ আমি তো তোমারই—

দূরের অনিল ॥ না—

অসীমা ॥ আজও তোমার—

দূরের অনিল ॥ না—

অসীমা ॥ আমি তোমায় ভালবাসি—

দূরের অনিল ॥ তোমার ভালবাসা—আমার ভালবাসাকেই শুধু চায়, সংগ্রামকে নয়—

অসীমা ॥ আমাকে তোমার সংগ্রামের সাথী করে নিলে না কেন ?

দূরের অনিল ॥ তুমি চাইতে না বলে—

অসীমা ॥ জোর করলে না কেন ?

দূরের অনিল ॥ তুমি ভেঙে যেতে—

অসীমা ॥ আজও তো আমি আছি—

দূরের অনিল ॥ তুমি তোমার একার পৃথিবী নিয়ে আছ।

অসীমা ॥ সে পৃথিবী তো তোমারও—

দূরের অনিল ॥ সংগ্রামের পৃথিবী ছাড়া—অন্য পৃথিবীকে আমি চিনি না অসীমা।

অসীমা ॥ আমি কি করব ?

অসীমার মন ॥ আত্মহত

অসীমা ॥ আত্মহত্যা ?

অসীমার মন ॥ একার পৃথিবীতে আমিই শুধু তোমার একমাত্র বন্ধু—

অসীমা ॥ আত্মহত্যা ?

অসীমার মন ॥ আত্মহত্যা—

অসীমা ॥ আত্মহত্যা পাপ।

অসীমার মন ॥ যথার্থ আত্মহত্যাই বাঁচা—

অসীমা ॥ আত্মহত্যা ! আত্মহত্যা ! —আত্মহত্যা—! আত্মহত্যা—! আত্মহত্যা ? না, না, না—আমি বাঁচবো—আমি বাঁচবো—

[চীৎকার করে উঠল। ভিতর থেকে সবাই ছুটে এল।]

আমি বাঁচব—আমি বাঁচব—কোথায়, কোথায়—আমার বেঁচে থাকার দরজা—কোথায়—কোনদিকে—কোথায়—

[ছুটে বাইরের দরজার দিকে যেতেই]

সোনা ॥ বৌদি—

[সুকুমারের সঙ্গে একজন শ্রমিকের প্রবেশ]

সুকুমার ॥ বৌদি অনিল আসছে—

অসীমা ॥ আসছে—

সুকুমার ॥ আসছে—

কর্তা ॥ বড় খোকা আসছে—

শ্রমিক ॥ আসছে—

অসীমা ॥ সে আসছে—

শ্রমিক ॥ মিছিল তাকে নিয়ে আসছে—

অসীমা ॥ আসছে—

শ্রমিক ॥ দুদিন পর তাকে আমরা পেয়েছি।

অসীমা ॥ সে আসছে—সে আসছে—আমি বেঁচে গেছি—আমি বেঁচে গেলাম—

শ্রমিক ॥ মালিকের গুণ্ডারা তাকে হত্যা করেছে—

[সবাই কথটা শুনল। নির্বাক নিস্পন্দ সবাই]

অসীমা ॥ হত্যা!

কর্তা ॥ হত্যা—!

সোনা ॥ হত্যা!

কমলা ॥ হত্যা!

কর্তা ॥ আমি তাকে মেরেছি—মেজ বৌ—আমি তাকে মেরিছি—

সোনা ॥ আমার সেই সূর্যমুখী ফুলটা—আবার দেখতে পাচ্ছি—ওই যে, অন্ধকারে ফুটছে—

কমলা ॥ আঃ—কতকাল পরে আবার বড় খোকাকে পেলাম। কতকাল—কতকাল পরে—আবার বুকের মধ্যে সবাইকে পাচ্ছি—এই যে সোনা,

এই যে তুমি—এই যে বৌমা, এই যে সব—সব—। বুকের মধ্যে হাতের নাগালে সবাইকে পাচ্ছি—সবাইকে পাচ্ছি—

[দূরের মিছিলের আওয়াজ আসছে]

অসীমা ॥ ওই আসছে—আসছে—আমার সমস্ত দরজা খুলে দিয়ে সে আসছে—

[মিছিলের শব্দ স্পষ্টতর হল]

সংগ্রাম হয়ে আসছে। আমি জেনেছি। আমি বুঝেছি। আমি দেখে নিয়েছি কোথায় আমার বেঁচে থাকার দরজা। আমি জেনে নিলাম—দেখে নিলাম—বেঁচে থাকার দরজা।

[সোনা অসীমার কথার প্রতিধ্বনি করল]

সোনা ॥ আমি জেনে নিলাম—দেখে নিলাম—বেঁচে থাকার দরজা। আমি জেনে নিলাম—দেখে নিলাম—বেঁচে থাকার দরজা—

অসীমা ॥ আমি জেনে নিলাম—দেখে নিলাম বেঁচে থাকার দরজা—

[মিছিলের শব্দ দীর্ঘতর হয়ে সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তারই মধ্যে সোনা অসীমার কণ্ঠ ধীরে ধীরে ডুবে যাবে। পর্দা নেমে আসবে]

[অসীমার অন্তর্দ্বন্দ্বের সংলাপগুলি অসীমাই বলতে পারবেন। মঞ্চ অন্ধকার করে আলোর বৃত্ত ফেলে অনিলকে মঞ্চে আনতে পারবেন। এই নাটক অভিনয় করতে হলে অনুমতির প্রয়োজন হবে]

বের্টল্ট ব্রেশট কর্তৃক বিরচিত

ও

উৎপল দত্ত কর্তৃক অনুবাদিত

সমাধান

[মূল কাহিনী—ডী মাস্‌নামে]

চরিত্র

প্রধান সূত্রধার, চারজন বিপ্লবী, যুবক কমরেড, নেতা, সর্দার, কুলিগণ, শ্রমিকগণ, পুলিশ ও ব্যবসায়ী।

প্রধান সূত্রধার ॥ এগিয়ে আসুন। আপনাদের কাজ শুভসূচনায় ভাস্বর। চীনে অগ্রসরমান বিপ্লব, যোদ্ধারা সংঘবদ্ধ যুদ্ধের সারিতে।

চারজন বিপ্লবী ॥ দাঁড়ান, কিছু বলার আছে। একজন কমরেড নিহত, সে সংবাদ দিতে চাই।

প্রধান সূত্রধার ॥ কে তাকে হত্যা করেছে?

চারজন বিপ্লবী ॥ আমরা মেরেছি। গুলি করে ওর দেহ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি চুনভরা গর্তে।

প্রধান সূত্রধার ॥ কি করেছিল সে, যে কমরেডকে গুলি ক'রে মারলেন?

চারজন বিপ্লবী ॥ বহুবার সে ঠিক কাজটাই করেছিল, কয়েকবার করেছিল ভুল। কিন্তু অবশেষে সে বিপন্ন করেছিল পুরো আন্দোলনকে। চাইছিল ভাল করতে, করলো মন্দ। আমরা আপনাদের অভিমত দাবি করি।

প্রধান সূত্রধার ॥ তথ্য উপস্থিত করুন—কি ক'রে ঘটলো, কেন—তবেই আমরা রায় দেব।

চারজন বিপ্লবী ॥ আমরা আপনাদের বিচার মাথা পেতে নেব।

১ ॥ মার্কসবাদ শিক্ষা ॥

চারজন বিপ্লবী ॥ আমরা এসেছিলাম মস্কো থেকে, গিয়েছিলাম চীনের মুকড়েন শহরে, প্রচার করতে এবং কারখানায় কারখানায় চীনের পার্টিকে সাহায্য করতে। আমরা গিয়েছিলাম পার্টির সদর দপ্তরে রিপোর্ট করতে, এক পথপ্রদর্শক যোগাড় করতে। এমন সময় বাইরের ঘরে ঢুকলো এক যুবক ইওরোপীয় কমরেড, আলাপ হলো। যে কাজে এসেছি বললাম তাকে। সে কথাবার্তা পুনরভিনয় করে দেখাচ্ছি আপনাকে।

[তিনজন একদিকে দাঁড়ালো, চতুর্থজন যুবক কমরেড সেজে দাঁড়ালো অন্যপাশে]

যুবক কমরেড ॥ এই যে পার্টি অফিস দেখছেন, এটা সহরের প্রান্তে। আমি এর দপ্তর সম্পাদক। আমার হৃদপিণ্ড বিপ্লবের আকাঙ্খায় স্পন্দিত। অন্যায়ের বীভৎস দৃশ্য আমায় ঠেলে দিয়েছে সংগ্রামী সারিতে। মানুষের ধর্ম মানুষকে সাহায্য করা। আমি স্বাধীনতার পক্ষে। আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি। আমি কমিউনিস্ট পার্টির মানবতাবাদের পক্ষে, যে পার্টি শোষণ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে শ্রেণীহীন সমাজের জন্য লড়াই করছে।

তিন বিপ্লবী ॥ আমরা মস্কো থেকে আসছি।

যুবক কমরেড ॥ আমরা আপনাদের অপেক্ষায় ছিলাম।

তিন বিপ্লবী ॥ কেন ?

যুবক কমরেড ॥ আমরা এগুতে পারছি না। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও দারিদ্র্য, খাবার নেই, অনবরত লড়াই। বহু মানুষ সাহসে উদ্দীপ্ত, কিন্তু মুষ্টিমেয় জানে লেখাপড়া। চিয়াং-এর সরকার মেশিন আনায় না, যা-ও বা আছে কেউ বোঝে না। এখানকার রেলইঞ্জিনগুলো খানায় পড়ে আছে। আপনারা কি রেলইঞ্জিন এনেছেন সঙ্গে ?

বিপ্লবীরা ॥ না।

যুবক কমরেড ॥ তবে কি ট্র্যাক্টর এনেছেন ?

বিপ্লবীরা ॥ না।

যুবক কমরেড ॥ এদেশের কৃষকরা এখনও মান্ধাতা আমলের কাঠের লাঙল ব্যবহার করে। আমাদের কিছু নেই যা দিয়ে ক্ষেতের জমি তৈরী করতে পারি। আপনারা কি ভাল বীজ এনেছেন কিছু?

বিপ্লবীরা ॥ না।

যুবক কমরেড ॥ তবে কি গুলিবারুদ আর মেশিনগান এনেছেন?

বিপ্লবীরা ॥ না।

যুবক কমরেড ॥ এখানে আমাদের বিপ্লবকে রক্ষা করতে হচ্ছে। নিশ্চয়ই আপনারা আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি নিয়ে এসেছেন, যে চিঠিতে বলে দেয়া আছে কী আমাদের করা উচিত।

বিপ্লবীরা ॥ না।

যুবক কমরেড ॥ তবে কি আপনারা চান চীনারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা মেটাক, অন্য দেশের কমিউনিস্টরা হাত গুটিয়ে বসে থাক?

বিপ্লবীরা ॥ না।

যুবক ॥ এই মলিন পোষাক বদলাবার সময় পাই না আমরা, দিনে বা রাত্রে। রুখতে হচ্ছে ক্ষুধা, ধ্বংস আর প্রতিবিপ্লবকে। অথচ আপনারা এসেছেন শূন্য হাতে।

বিপ্লবীরা ॥ কথাটা ঠিক, হাত আমাদের শূন্য। কিন্তু মুকডেনের উপকণ্ঠে চীনের শ্রমিকদের জন্য এনেছি মার্কসবাদের শিক্ষা, প্রচারবিদের অভিজ্ঞতা। এনেছি সাম্যবাদের গোড়ার কথা। যারা বোঝে না তাদের জন্য এনেছি উপলব্ধি, অত্যাচারিতের জন্য এনেছি শ্রেণীসংগ্রামের বাণী, আর শ্রেণীসচেতনের জন্য বিপ্লবের অভিজ্ঞতা। আপনাদের কাছে চাইছি শুধু একটি মোটরগাড়ী ও একজন পথপ্রদর্শক।

যুবক ॥ আমার প্রশ্নগুলো কি অভদ্রোচিত হয়েছে?

বিপ্লবীরা ॥ না। ভালো প্রশ্ন, তাই আরো ভালো জবাব পেলেন।

দেখছি আপনারা ইতিমধ্যে বিপুল কাজ করেছেন, কিন্তু আরো অনেক করতে হবে। আপনাদের একজন দয়া করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান শহরের মধ্যে।

যুবক ॥ আমাকে তাহলে এখানকার কাজ ছেড়ে যেতে হবে; দুজনে মিলে সামাল দিতে পারছিলাম না, এখন একজনের ঘাড়ে সব পড়বে। তবু আমিই যাবো আপনাদের সঙ্গে। অগ্রসর হই আসুন, সাম্যবাদের শিক্ষাকে উর্ধ্বে তুলে ধরি—প্রচার করি বিশ্ববিপ্লব।

প্রধান সূত্রধার ॥ সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়গান ॥

ইতিমধ্যে দুনিয়া জুড়ে উঠেছে কথা
কী দুর্ভাগা এই দেশ।
কিন্তু আমাদের দরিদ্র দ্বারদেশে
অপেক্ষমান দুনিয়ার শোষিতের যত আশা,
খালি পেটে জল খেয়ে তৃপ্ত।
ভাঙা কপাটের পেছনে বসে
উচ্চকণ্ঠে শেখাচ্ছি বিপ্লববিজ্ঞান সর্বহারা অতিথিদের।
দ্বার যদি ভেঙে যায়, যাক না;
আরো জমিয়ে বসবো নিরুদ্বেগে।
শীত আর ক্ষুধা যাদের পারবে না মারতে
তারাই ক্লান্তিহীন বুকে করে রাখবে
সারা দুনিয়ার ভবিষ্যৎ।

চার বিপ্লবী ॥ এইভাবে ঐ যুবক কমরেড শহর প্রান্তের পার্টি দপ্তরে বসে আমাদের কাজের স্বরূপ বুঝলো। তারপর আমরা গেলাম—চারজন পুরুষ এবং একজন নারী—চীনের পার্টির এক নেতার কাছে।

২ ॥ সত্তা বিলোপ ॥

চার বিপ্লবী ॥ কিন্তু মুকডেনে পার্টি তখন বে-আইনী। সেইজন্য শহরে ঢোকবার আগে দরকার হোলো আমাদের চেহারাগুলো মুছে দেয়ার। যুবক কমরেড এ বিষয়ে একমত হোলো। যা বললাম করে দেখাচ্ছি।

[একজন বিপ্লবী পার্টি-নেতা সাজলো।]

নেতা ॥ আমি এই পার্টি-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। আমাদের এই কমরেড যে আপনাদের সংগে পথ-প্রদর্শক হিসেবে যাবেন, তাতে আমি রাজী। মুকডেনের কারখানায় এখন বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং মনে হচ্ছে পুরো দুনিয়ার শাসকগোষ্ঠী এই শহরে এসে ভীড় করেছে, চীনের শ্রমিকদের টুপির তলায় কে কে কমিউনিস্ট তাই খুঁজছে। শুনেছি নদীতে প্রস্তুত হয়ে আছে ছোট ছোট যুদ্ধজাহাজ; সাঁজোয়া রেলগাড়ি দখল করে রেখেছে রেললাইনের বাঁধ; আমাদের কাউকে দেখতে পেলেই ধরবে। আমি স্থির করেছি এই কমরেডরা চীনা সেজে সীমান্ত পেরুবেন। (বিপ্লবীদের) আপনারা কোনোমতেই দেখা দেবেন না।

চার বিপ্লবী ॥ দেখা দেব না।

নেতা ॥ আপনাদের একজন যদি আহত হয়, তবুও সে ধরা দেবে না।

বিপ্লবীরা ॥ ধরা দেবে না।

নেতা ॥ অর্থাৎ আপনারা মরতে প্রস্তুত আছেন? এবং সেই মৃত্যুকেও গোপন করতে প্রস্তুত আছেন?

বিপ্লবীরা ॥ হ্যাঁ।

নেতা ॥ তাহলে এই মুহূর্ত থেকে আপনাদের নিজস্ব সত্তা বিলুপ্ত হোলো। আপনি আর বের্লিনের কার্ল শ্‌মিট্ নন্, আপনি নন কাজানের আনা কিয়েরস্‌ক্, আপনি মস্কোর পিয়োতর সাভিচ নন। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, নাম নেই, মা নেই, আপনারা সাদা পাতা যার বুকে বিপ্লব তার নির্দেশ লিখবে।

বিপ্লবীরা ॥ হ্যাঁ।

নেতা ॥ (মুখোশ বিতরণ করেন, বিপ্লবীরা পরে ফেলে) এই মুহূর্ত থেকে আপনারা অজ্ঞাতকুলশীল। যতদিন না আপনারা কর্মক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন, ততদিন আপনারা অচেনা শ্রমিক, যোদ্ধা, চীনা, আপনারা চীনা মাতার গর্ভে জাত, হলদে চামড়া আপনাদের দেহে, নিদ্রায়-জাগরণে চীনা ভাষা বলে থাকেন।

বিপ্লবীরা ॥ হ্যাঁ।

নেতা ॥ সাম্যবাদের স্বার্থে প্রত্যেক দেশের সর্বহারার অগ্রগতি আপনারা সমর্থন করেন, পুরো দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটানো আপনাদের দায়িত্ব?

বিপ্লবীরা ॥ হ্যাঁ।

[এবং যুবক-কমরেডটিও বললো, হ্যাঁ। অর্থাৎ নিজের অবয়ব মুছে ফেলার প্রস্তাবে সে সম্মতি জানালো।]

প্রধান সূত্রধার ॥ যে সাম্যবাদের সংগ্রামে ঝাঁপ দেবে।

তাকে লড়তে হবে, আবার না-লড়তেও জানতে হবে,
সত্য কথা বলার হিম্মৎ চাই, আর চাই
তা না-বলারও হিম্মৎ,
অনেক কাজ করতে হবে, কাজ না-করতেও পারতে হবে,
প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে, প্রতিশ্রুতি ভাঙতে হবে,
বিপদ বরণ করতে হবে, বিপদ এড়ানোও শিখতে হবে,
দৃষ্টিগোচর হতে হবে, অদৃশ্যও হতে হবে।
সাম্যবাদের সংগ্রামে যে দিতে চায় ঝাঁপ
মহৎ গুণের মধ্যে তার থাকবে শুধু একটি—
সে সাম্যবাদের সংগ্রামী।

বিপ্লবীরা ॥ চীনা সেজে আমরা চললাম মুকডেনের দিকে, চার পুরুষ ও এক নারী।

যুবক-কমরেড ॥ প্রচার করতে, মার্কস্‌বাদী মূলনীতি শিখিয়ে চীনা-শ্রমিকদের

সাহায্য করতে, সাম্যবাদের গোড়ার কথা ছড়িয়ে দিতে করতে, অজ্ঞানকে সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানবান করতে, শোষিতকে শ্রেণীসংগ্রাম শেখাতে আর শ্রেণীসচেতনকে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা পৌঁছে দিতে।

প্রধান সূত্রধার ॥ গোপন বিপ্লবীদের জয়গান ॥

শ্রেণীসংগ্রামের কথা কইতে ভাল লাগে,
ভাল লাগে উচ্চ বজ্রকণ্ঠে জনতাকে ডাক দিতে
শোষককে চূর্ণ করার, শোষিতকে মুক্ত করার সংগ্রামে।
কিন্তু বড়ই কঠিন, বড় প্রয়োজন দৈনন্দিন ক্ষুদ্র কাজ,
পুঁজিপতির উদ্যত রাইফেলের ডগায়,
পার্টির বিরাট জালের
গোপন যোগাযোগ বাঁচিয়ে রাখা।
কথা কইতে হবে কিন্তু কথক থাকবে লুক্কায়িত,
জিততে হবে অথচ বিজেতা থাকবে গোপন,
মরতে হবে অথচ শহীদ হওয়া চলবে না।
যশগৌরবের জন্য কে না করে প্রাণপাত,
কিন্তু নীরবতার জন্য কে আসবে এগিয়ে ?
তথাপি যখন সেই দরিদ্র বুভুক্ষুকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে
বসানো হয় ইতিহাসের ভোজসভার সম্মানের আসনে,
আর দোমড়ানো, ভাঙা টুপি খুলে এগিয়ে আসে
সেই মহান মানুষ,
গৌরব অবাক হয়ে ব্যর্থ জিজ্ঞাসা করে ফেরে,
কে এই কীর্তিমান, কী তার কীর্তি ?
এক লহমার জন্য বেরিয়ে এস,
হে অজ্ঞাত, লুক্কায়িত ইতিহাসের দল,
আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করো।

চার বিপ্লবী ॥ মুকডেন শহরে আমরা আমাদের চীনা কমরেডদের সাহায্য করতে লাগলাম, প্রচার চালাতে লাগলাম শ্রমিকদের মধ্যে। ক্ষুধিতের জন্য অন্ন হাতে যাই নি আমরা, গিয়েছিলাম শুধু অবুঝকে বোঝাতে; বোঝাতে লাগলাম দুঃখের মূল কোথায়। দুঃখদুর্দশাকে উপড়ে ফেলতে যাই নি, গিয়েছিলাম দুঃখদুর্দশার মূল ওপড়াবার কথা কইতে।

৩ ॥ পাথর ॥

বিপ্লবীরা ॥ প্রথমে গেলাম শহরতলির দিকে। সেখানে কুলিরা মালবোঝাই নৌকোর গুন টানছিল ডাঙা ধরে। কিন্তু মাটি ছিল পিছল। কেউ পড়লেই সর্দার তাকে মারছিল চাবুক। আমরা বললাম যুবক কমরেডটিকে : ওদের পেছনে যাও, প্রচার করো। বলো, তুমি ভিয়েনৎসিন শহরে দেখো এসেছে নৌকোর কুলিদের জন্য বিশেষ নালমারা জুতোর ব্যবহার, যাতে পা না পিছলোয়। ওরাও যেন সেই জুতো দাবি করে, সেই চেষ্টা করো। কিন্তু দোহাই তোমার— মায়ামমতায় হঠাৎ যেন আচ্ছন্ন হয়ো না। তারপর প্রশ্ন করলাম : তুমি রাজী? সে জানালো : রাজী। ছুটে গেল ঘটনাস্থলে এবং মুহূর্তের মধ্যে দয়া উথলে উঠলো তার প্রাণে। দেখাচ্ছি ব্যাপারটা।

[দু'জন সাজলো কুলি, একটা খুঁটিতে দড়ি বেঁধে সে দড়ি কাঁধের উপর নিয়ে টানতে লাগলো। একজন হলো যুবক কমরেড, চতুর্থজন সর্দার]

সর্দার ॥ আমি হচ্ছি কুলিদের সর্দার। আজ সন্ধ্যার মধ্যে এই নৌকো ভর্তি চাল বাজারে পৌঁছে দিতে হবে।

কুলিরা ॥ আমরা কুলি, নদী বয়ে চালের নৌকো টেনে নিয়ে যাই।

॥ চালের নৌকো টানার গান ॥

নদীর ধারের শহরে যাবে মাল,
সেখানে পাব এক-এক মুঠো চাল।

এ নৌকো বড় ভারী,
তবু দিতে হবে পাড়ি,
নদীর জল উঠছে দেখ মেতে,
আর পারি না উজান বয়ে যেতে।
জোরে টানো, হাঁ-গুলো
বসে আছে খাবে বলে,
সোজা টানো, ঠেলছ কেন,
পেছনের লোক, সাবধান!

যুবক-কমরেড ॥ কী বীভৎস গানটা, আবার সুন্দরও লাগলো। শ্রমের যন্ত্রণার উপর প্রলেপ।

সর্দার ॥ জোরে টান্।

কুলিরা ॥ (গান গাইছে)
রাত আসছে আঁধার মেলে
একমুঠো ভাত কিনে খেলে
ঘরভাড়া বাকি পড়ে
কুকুর-বেড়াল শোয় না অমন ঘরে।
এ কাদায় পা হড়কে যায়,
তাই এগুনো হোলো দায়।

একজন কুলি ॥ (পা পিছলে পড়ে গিয়ে) আর যেতে পারছি না।

অন্য কুলি ॥ (দাঁড়িয়ে চাবুক খাচ্ছে; যে পড়ে গিয়েছিল সেও চাবুক খেয়ে উঠে দাঁড়ায়)
কাঁধে বাঁধা এই দড়া
আমাদের চেয়ে অনেক কড়া
ঐ চাবুকটাই বা কিসের কম,

চার পুরুষ ধরে কুলির যম,
আমরা হলাম সব শেষের দল।

যুবক ॥ নিরুত্তাপ দয়াহীন চোখে এই লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা বড় কঠিন। (সর্দারকে) দেখছেন না মাটি, একেবারে পিছল হয়ে আছে?

সর্দার ॥ মাটি কি হয়ে আছে?

যুবক ॥ পিছল।

সর্দার ॥ কী? আপনি কি বলতে চান যে মাটি এত পিছল যে চালের নৌকো টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না?

যুবক ॥ হ্যাঁ, তাই বলছি।

সর্দার ॥ মানে মুকডেন শহরের চাল দরকার নেই তবে?

যুবক ॥ কুলিরা পড়ে মরলে, নৌকো টানবে কে?

সর্দার ॥ আমার তাহলে উচিত এখান থেকে মুকডেন শহর পর্যন্ত এই মহাপ্রভুদের পায়ের তলায় পাথর সাজাতে সাজাতে যাওয়া!

যুবক ॥ আপনার কী উচিত আমি জানি না, তবে এদের কী করা উচিত জানি। এদের উচিত কাজ বন্ধ করে দেয়া। ভাববেন না দু' হাজার বছর ধর্মঘট হয়নি বলে আজো হতে পারে না। তিয়েনৎশিন শহরে আমি দেখে এসেছি কুলিদের জন্য নাল-মারা জুতো, যা পিছলোয় না। ওরা ঐক্যবদ্ধ দাবী তুলে সেটা আদায় করেছে। আপনারাও এক হয়ে সে দাবী তুলুন।

কুলিরা ॥ ওরকম জুতো ছাড়া আমরা এ নৌকো টানতে পারব না।

সর্দার ॥ কিন্তু আজ সন্ধ্যার মধ্যে এ চাল মুকডেন পৌঁছুতেই হবে।

[চাবুক চালিয়ে কুলিদের নৌকো টানতে বাধ্য করে]

কুলিরা ॥ বাপ-ঠাকুর্দা নাও টেনেছে
মোহনা থেকে বন্দরে,

মাল বয়ে নিয়ে গেছে এর চেয়ে বহুগুণ।
ছেলে নাতি এমন কাজের মুখে দেবে আগুন।
আমরা শুধু পড়ে গেছি মাঝে।

[প্রথম কুলি আবার পড়ে যায়]

কুলি ॥ বাঁচাও আমায়!

যুবক ॥ (সর্দারকে) আপনি কি মানুষ? এই দেখুন কত সহজ, একটা পাথর নিয়ে কাদায় রেখে দিলাম—(কুলিকে) এর ওপর পা দাও।

সর্দার ॥ খুব ঠিক। তিয়েনৎসিনে জুতো আছে তো এখানে কি কাজে লাগবে বলুন। তার চেয়ে বরং আপনাকে অনুমতি দেয়া গেল, আপনি একখানা পাথর নিয়ে আপনার এই হতভাগ্য সাথীদের পেছন পেছন আসুন, এবং যে পা পিছলে পড়বে তারই পায়ের তলায় পেতে দেবেন।

কুলিরা ॥ নৌকো বোঝাই চাল!

ফুটো পয়সা পেল চাষী,
আমরা আরো কম।
কুলির চেয়ে বলদ-জোতায় খরচ অনেক বেশি,
মানুষ সবচেয়ে সস্তা, কারণ সংখ্যায় সে বেশি।

[এক কুলি পড়ে যেতে যুবক পাথর পেতে দেয়। সে আবার সোজা হয়]

শহরে বসে বাবুরা খায় ভাত কাঁড়ি-কাঁড়ি,
বাচ্চাগুলো এসে শুধোয় দেখিয়ে ভাতের হাঁড়ি,
কে টেনে আনলো বলো নৌকো অমন ভারী,
বাবুরা তখন বুঝিয়ে দেয়—আনা হয়েছে বুঝলি?

[অন্য কুলি পড়ে যেতে যুবক আবার পাথর পেতে তাকে তোলে]

নীচ থেকে চাল আসছে ওপর তলার পাতে

যারা সে চাল বয়ে আনছে তারা পায় না খেতে।

[আবার এক কুলির-পতন, যুবকের পাথর-পাতা]

যুবক ॥ আমি আর পারছি না বাবা! নাল-মারা জুতো দাবী করতেই হবে তোমাদের!

এক কুলি ॥ এ এক বুদ্ধু দেখছি, হাসি পায়।

সর্দার ॥ না, এ শালা সেই দলের লোক, যারা আমাদের বিরুদ্ধে লোক খ্যাপায়। এ্যাইও, ধর্ তো বাছাধনকে!

বিপ্লবীরা ॥ তৎক্ষণাৎ ধরা পড়লো সে। হাত ছাড়িয়ে দু'দিন ধ'রে পালিয়ে বেড়ালো, তারপর আমাদের কাছে এল, পেছনে ফেউ-সমেত। তখন আমরাও ওকে শুদ্ধু সাতদিন ধরে সারা শহর পালিয়ে বেড়ালাম, পেছনে পুলিশ। আরেকটু হলে এ জীবনে আর শহরে নিজেদের আড্ডাটা চর্মচক্ষে দেখতে হোতো না।

॥ আলোচনা ॥

প্রধান সূত্রধার ॥ কিন্তু দুর্বলকে রক্ষা করা নয় কি মহৎ?
যেখানে শোষিত দৈনন্দিন যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট,
তাকে সাহায্য করা উচিত নয়?

বিপ্লবীরা ॥ সাহায্য কোথায় করলো সে? শুধু আমাদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করলো। আমাদের প্রচারকার্য ব্যাহত হোলো।

সূত্রধার ॥ আমরা একমত।

বিপ্লবীরা ॥ এ তো দেখাই যাচ্ছে—যুবক কমরেডটি অনুভূতি থেকে বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে বসে আছে। তবু আমরা ওকে বোঝালাম, সান্ত্বনা দিলাম। বললাম কমরেড লেনিনের কথা—

সূত্রধার ॥ " বুদ্ধিমান যে ভুল করে না সে নয়,
বুদ্ধিমান হোলো যে কৃত ভুল সংশোধন করতে পারে।

৪ ॥ ক্ষুদ্র অন্যায় ও বৃহৎ অন্যায় ॥

বিপ্লবীরা ॥ প্রথম পার্টি-সেল তৈরি করলাম কারখানাগুলোয়, প্রথম কমিউনিস্ট কর্মিবৃন্দকে শিক্ষিত ক'রে তুললাম; পার্টি-স্কুল তৈরি করে শেখালাম নিষিদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করার কায়দা! সুতোকলে আমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেল, এবং তারপরেই সেখানে বেতন কাটার প্রতিবাদে শ্রমিকদের এক অংশ ধর্মঘট ক'রে বেরিয়ে এল। কিন্তু অন্য অংশ কাজ ক'রে চললো, ফলে ধর্মঘট বিপন্ন। যুবক কমরেডকে আমরা বললাম: কারখানার গেটে যাও, এই প্রচারপত্র বিলি করো। সে রাজী হোলো। কথাবার্তাটা পুনরভিনয় করছি।

তিন বিপ্লবী ॥ চালের নৌকার কুলিদের ব্যাপারে তুমি খেড়িয়েছিলে?

যুবক কমরেড ॥ হ্যাঁ।

বিপ্লবীরা ॥ তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছ?

যুবক ॥ হ্যাঁ।

বিপ্লবীরা ॥ লীফলেট-বিলির কাজটা অমন হবে না তো?

যুবক ॥ না।

বিপ্লবীরা ॥ এবার দেখাচ্ছি লীফলেট-বিলির ব্যাপারে যুবক-কমরেডের কাজের মহিমা।

[দু'জন সাজলো সুতোকল শ্রমিক, একজন সাজলো পুলিশ]

শ্রমিকরা ॥ আমরা সুতোকলের মজদুর।

পুলিশ ॥ আমি পুলিশ-কনস্টেবল, মালিকশ্রেণী আমায় খাবার দিয়ে পোষে বিক্ষুব্ধদের ঠেকাবার জন্য।

সূত্রধার ॥ এগিয়ে এস, কমরেড! পয়সার বন্ধন ফেল ছিঁড়ে,
ও দুটো পয়সার মূল্য কী?
মাথা গোঁজবার চালা ধুয়ে যাবে বৃষ্টিতে,
চাকরিটাও তো আজ বাদে কাল যাবেই যাবে।

এই গ্রন্থের পঞ্চম নাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'বাইরের দরজা"।

সহজ পথে চলতে গিয়ে অনেক সময় পথ চলাই বন্ধ হয়। যে মুহূর্তে বন্ধ হয়, সেই মুহূর্তেই চলা কঠিন হয়ে ওঠে। আর এই কঠিনের নামই সাহস। কেননা সাহস ভরে বাঁচাই হচ্ছে জীবন।

স্বপ্নে গড়া অবস্তু গল্পের মধ্যে দিয়ে এই কথাটি বলার চেষ্টা হয়েছে।

এই একাঙ্কে গ্রথিত অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এই সব স্বগতোক্তি' ষষ্ঠ নাটক।

শ্রেণী শোষণের পতন সুনিশ্চয়। চূড়ান্ত তার নিঃশেষের আয়োজন। যে নায়কেরা ধানক্ষেতের রক্তে পা ডুবিয়ে সভ্যতা গড়ছিল, কারখানার গেটে রক্তের মহাজনী করে সভ্যতার বাণিজ্য করছিল আর কচি কলাপাতার মতন শিশুদের মাংসে সভ্যতার ভোজ তৈরি করছিল...তারা এখন এসে ভয়ে সঙ্কোচে জন্তুর মতন দলা পাকিয়ে যাচ্ছে...কেননা ধানক্ষেত থেকে আসছে চাষীরা, বাহুমূলের সভ্যতা নিয়ে আসছে মজুরেরা সারা বিশ্বঘুরে।

শ্রম সম্মানেই সূর্যের সন্তানদের মুক্তি,—এই সূর্যস্নানেরই নাটক হচ্ছে 'এই সব স্বগতোক্তি'।

আত্মসংলাপী আপন চরিত্রের আপন মুখোস উন্মোচন করার ভঙ্গীতে কবিতা অঙ্গে বিশ্বতত্ত্বের এই বক্তব্যটিকে নাট্যদ্বন্দ্ব মূর্তি দেওয়া হয়েছে।

এই সঙ্কলনের সর্বশেষ নাটক 'কেয়াকুঞ্জ'। মূল নাটক রুপার্ট ব্রুকের "লিথুয়ানিয়া।" অনুসরণ : ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায়।

বঞ্চিতের লোভ ও বাসনা তাদের কাছে পাপের সমস্ত দরজা খুলে দেয়। বঞ্চনা মানুষকে নির্দয় নিষ্ঠুর করে তোলে। মানুষ তার শেষ মূল্যটুকুও হারিয়ে ফেলে। জান্তব ও পাশব বৃত্তিই তখন নিহত মনুষ্যত্বের ওপর বিরাজ করতে থাকে। মাতৃত্বও পরাজিত হয়।

এমনি এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার মানুষের অন্ধকার পৃথিবীর নাটক "কেয়াকুঞ্জ"

গ্রন্থিত নাট্যসমূহের নাট্যকার ও অন্যান্য যাঁরা এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন সেই কালিপদ দাস ও সত্যপ্রিয় বড়ুয়ার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা জানানো হল গভীর শ্রদ্ধায়।

সর্বশেষে, যে ছিন্নভিন্ন ভাবনার নাট্যায়নগুলি দেওয়া গেল তা যদি বর্তমান নাট্যযুগকে মননচারিতার কাছে শুধু জানিয়ে দেবার কাজটুকু করতে পারে আশা করব তাহলে, নাট্য আন্দোলন তার আপন চলার ভাবনা আপনিই বেছে নিতে পারবে।

ভেঙে গিয়ে ব্যর্থ হল এবং সমগ্র পার্টি সংগঠনকে বিপদগ্রস্ত করে তুলেছিল সেই মার্কসবাদী শিক্ষার অসামান্য গুরুত্বকে কেন্দ্র করেই এই নাটক রচিত হয়েছে।

নাটকটি কমিউনিষ্ট নৈতিকতাকে ও কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনে সাহায্য করবে।

তৃতীয় নাটক সুনীল দত্ত বিরচিত আত্মসংলাপী নাটক "রাত কবে শেষ হবে।"

জীবনের চারদিকে এখন গভীর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের জানালা দিয়ে একজন বাঁচতে চাওয়া মানুষ জীবনের পুরোনো আয়নায় মুখ রাখল। তার মুখের ছবিতে শোষণ মুখর সমাজের ঘৃণ্য, কদর্য, ক্লেদাক্ত ছবি ফুটে উঠতে লাগল। পাশাপাশি জীবনের ভাঙনের পথ বেয়ে মানুষটি দেখল এতদিনে যা ভাঙল তাই সে ধন্য হল। সে বেঁচে গেল। সে এই সমাজকে গায়ের জোরে ভেঙে আর এক স্বপ্নের সমাজ গড়বার প্রত্যয়কে পেয়ে গেল।

নাটকটি হতাশা থেকে সংগ্রামের পথে মানুষকে বাঁচাবার পথ দেখাবার জন্যে এখানে নির্বাচিত করা হয়েছে।

চতুর্থ নাটক আন্তন চেখভের 'সোয়াণ সঙ্' নাটকের অনুবাদ 'নানা রংয়ের দিন'। রূপান্তর : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঙ্গালয়, রঙ্গক ও প্রেক্ষক-এর সম্পর্ক নির্ণয় ও রঙ্গক জীবনের যাতনা, নিঃসঙ্গতা ও হাহাকারের সত্যই এই নাটকের মর্ম সত্য। শোষণ-গড়া এই সমাজে শিল্পীর কোন নিরাপত্তা নেই। নেই কোন সামাজিক সম্মান ও মূল্য। হাটের দামে বিক্কিরি হয় শিল্পী ও শিল্প। আর্ট যে দুনিয়া পাল্টানোর ভাবগত উপাদান এবং আর্টের জীবনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন এই নান্দনিক ও রাজনৈতিক সত্য শোষণের দেশে অমান্য। জনগণের থিয়েটার যে দিন হবে শিল্পী যেদিন জনগণের শিল্পী বলে নন্দিত হবেন…সেই দিন বাইরের সংগে শিল্পীর ও শিল্পীসত্তার সংগে ব্যক্তিসত্তার বিরোধের রাজনৈতিক সমাধান হবে, তার আগে নয়।

বেরিয়ে এস রাজপথে, লড়াই করো,
অপেক্ষা করলেই হয়ে যাবে বড় দেরি !
আমরা দাঁড়াবো পাশে কিন্তু নিজেই তুমি
নিজের মুক্তিদাতা। এক হও, মেহনতী মানুষ।

যুবক ॥ মুক্তি দাম দিতে হবে, কমরেড,
যা আছে সব দিতে হবে,
কারণ তোমার কিছুই নেই।

সূত্রধার ॥ রাইফেলের নলের ডগায় বুক পেতে দিয়ে এগোও, কমরেড
দাবী তোলো পুরো মজুরির।
যেদিন জানবে হারাবার মতো কিছুই নেই তোমার,
সেদিনই দেখবে পুলিশের হাতে
রাইফেল কম পড়েছে।

শ্রমিকরা ॥ কাল সকাল বেলায় যাব কারখানায় কাজে। মজুরি কেটেছে বটে
কিন্তু বুঝতে পারছি না কী করা উচিত, তাই কাজে যাওয়াই ভালো।

যুবক ॥ [একজনের হাতে একখানা প্রচারপত্র গুঁজে দিয়ে] নিজে পড়ুন
অন্যকে পড়ান। কাগজ পড়লেই জানতে পারবেন কী করা উচিত।
[কাগজ নিয়ে প্রথম শ্রমিক সরে যাচ্ছিল, পুলিশ হঠাৎ ছিনিয়ে নেয়]

পুলিশ ॥ এ কাগজ কে দিল ?

প্রথম ॥ জানি না, পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় কে একজন হাতে গুঁজে দিল।

পুলিশ ॥ [দ্বিতীয় শ্রমিককে] তুমি দিয়েছ এই কাগজ। এইসব লীফলেট
যারা বিলি করে তাদেরই তো আমরা গরুখোঁজা করছি।

দ্বিতীয় ॥ আমি কাউকে কাগজ-ফাগজ দিইনি বাবা।

যুবক ॥ অন্ধকারাচ্ছন্ন জনতাকে তাদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন
করে তোলা কি অপরাধ ?

পুলিশ ॥ তোমাদের সচেতন করার ঠেলায় অবস্থা সঙিন হয়ে উঠে। একখানা কারখানাকে সচেতন করলেই শ্রমিক-শালারা আর মালিকের তোয়াক্কা, রাখে না। এই ছোট্ট একখানা লীফলেট বাবা দশটা কামানের চেয়ে বিপজ্জনক।

যুবক ॥ কেন কী লেখা আছে ওতে ?

পুলিশ ॥ তা জানি না। [দ্বিতীয়কে] কী লেখা আছে ওতে ?

দ্বিতীয় ॥ আমি ও কাগজ জন্মে দেখিনি বাবা, আমি বিলি-ফিলি করিনি।

যুবক ॥ আমি জানি উনি কাগজ বিলি করেননি।

পুলিশ ॥ [যুবককে] তাহলে তুমিই নাটের গুরু নাকি ?

যুবক ॥ না।

পুলিশ ॥ [দ্বিতীয়কে] তাহলে তুমি।

যুবক ॥ [প্রথমকে] ওকে নিয়ে কি করবে ?

প্রথম ॥ গারদে পুরবে বোধহয়।

যুবক ॥ [পুলিশকে] একে গারদে পোরার জন্য আপনার এত মাথাব্যথা কেন, মশাই, আপনি নিজে শ্রমজীবী নন্ ?

পুলিশ ॥ [দ্বিতীয়কে] চল্ আমার সঙ্গে।

[মাথায় লাঠি মারতে যুবক বাধা দেয়]

যুবক ॥ দাঁড়ান, ও কিছু করেনি।

পুলিশ ॥ তাহলে তুই করেছিস্ !

দ্বিতীয় ॥ না, ও করেনি।

পুলিশ ॥ তাহলে তোরা দুটোয় মিলে করেছিস।

প্রথম ॥ [যুবককে] বীরত্ব না দেখিয়ে, কেটে পড়ো! থলি ভর্তি লীফলেট রয়েছে তোমার হাতে।

[দ্বিতীয়কে পুলিশ মেরে মাটিতে ফেলে]

যুবক ॥ নির্দোষ লোককে পেটাচ্ছে, তুমি সাক্ষী।

প্রথম ॥ [পুলিশকে ধ'রে] মালিকের কেনা কুকুর !

[পুলিশ পিস্তল টানে]

যুবক ॥ [চীৎকার করে] কমরেডরা ! ছুটে আসুন ! নির্দোষ মানুষকে প্রহার করছে ! [যুবক পেছন থেকে পুলিশের ঘাড় চেপে ধরে। প্রথম শ্রমিক পিস্তল-শুদ্ধ হাত চেপে নামিয়ে দিতে গুলি ব্যর্থ হয়। পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে ভূপাতিত করা হয়]

দ্বিতীয় ॥ পুলিশ ঠেঙিয়েছি ! কারখানায় যাওয়ার বারোটা বাজলো। [যুবককে] সব তোর জন্যে ! তুই বাধালি ?

বিপ্লবীরা ॥ কোথায় লীফলেট বিলি করবো, তা নয় ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে আমাদের কালঘাম ছুটে গেল। পুলিশ এমন ভাবে কারখানা ঘিরে ফেললো যে ভবিষ্যতেও কাগজ বিলির পথ বন্ধ হয়ে গেল।

॥ আলোচনা ॥

সূত্রধার ॥ কিন্তু অন্যায় ঘটতে দেখলেই বাধা দেয়া কি মহৎ নয় ?

বিপ্লবীরা ॥ ক্ষুদ্র একটি অন্যায় সে রুখলো। বদলে ধর্মঘট ভেঙে দেয়ার বিরাট অন্যায়টা এগিয়ে চললো অপ্রতিহত গতিতে।

সূত্রধার ॥ আমরা একমত।

৫ ॥ মানুষ আদতে কী ? ॥

বিপ্লবীরা ॥ দৈনন্দিন লড়াই চললো হতাশা আর পরাজয়ের চিরাচরিত যুক্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে। শ্রমিকদের আমরা শেখালাম মজুরির লড়াইকে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ে রূপান্তরিত করতে। বোঝালাম অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের কলাকৌশল। তারপর শুনলাম শহরের কিছু ব্যবসায়ীর সঙ্গে মুকডেনের অধিপতি ইংরেজদের বিরোধ বেধেছে শুল্কের হার নিয়ে। শাসকশ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেক বিরোধের সুযোগ শাসিতদের নিতে হবে, এই নীতি গ্রহণ করে আমরা যুবক

কমরেডকে পাঠালাম সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ীর কাছে একটি চিঠি দিয়ে। সে চিঠিতে লেখা ছিল : কুলিদের হাতে অস্ত্র দিন, টাকা দিন অস্ত্র কিনবার। যুবক কমরেডকে বললাম : এমনভাবে তোয়াজ করবে, যাতে অস্ত্র আমরা পাই। কিন্তু যখন ব্যবসায়ীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়ার সময় এল, তখন সামান্য চুপ করে থাকাও ওর পক্ষে সম্ভব হোলো না। দেখাচ্ছি দাঁড়ান। [একজন ব্যবসায়ী সাজলো]

ব্যবসায়ী ॥ আমি সেই ব্যবসায়ী। কুলিদের ইউনিয়ন থেকে একটি চিঠি আসবে শুনছি. তারই অপেক্ষায় রয়েছি। ওরা নাকি ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নামতে চায়।

যুবক ॥ এই যে ইউনিয়নের চিঠি।

ব্যবসায়ী ॥ বেশ, বেশ, আপনি আজ আমার গৃহে আহার করলে বড়ই বাধিত হই।

যুবক ॥ আপনার গৃহে আহার করতে পারা এক সম্মান।

ব্যবসায়ী ॥ যতক্ষণ রান্নাবান্না না হচ্ছে, বসুন এখানে, কুলিদের সম্বন্ধে আমার যা ধারণা হয়েছে আপনাকে বলতে চাই।

যুবক ॥ সেটা শুনতে আমি খুব আগ্রহী।

ব্যবসায়ী ॥ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে আমি সব কিছু শস্তায় পাই কেন জানেন ? কেন কুলিরা আমার জন্যে প্রায় বেগার খেটে যায় হাসিমুখে ?

যুবক ॥ জানি না।

ব্যবসায়ী ॥ কারণ আমি খুব চালাক। আপনারাও দাদা বেশ চালাক-চতুর আছেন, কুলিদের মাথায় হাত বুলিয়ে ওদেরই চাঁদা থেকে ইউনিয়নের মাইনে নেন। আপনারা আমার কায়দাগুলো ভাল বুঝবেন।

যুবক ॥ বেশ ভালই বুঝি। ভাল কথা, কী ঠিক করলেন ? আপনি কি কুলিদের হাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য অস্ত্র দেবেন ?

ব্যবসায়ী ॥ হয়তো দেব, কে বলতে পারে? আমি জানি কী ভাবে কুলিদের চালিয়ে নিয়ে চলতে হয়। এই দেখুন না—আমার ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র কী? ততটুকু চাল কুলিদের দিতেই হবে, যাতে সে পটল না তোলে, কারণ মরে গেলে কাজ করবে কে? ঠিক বলেছি?

যুবক ॥ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।

ব্যবসায়ী ॥ কিন্তু আমি সব সময়ে বলি: চালের চেয়ে যদি কুলির দাম বেশি হয়, তবে চলে কী করে? তার চেয়ে সে কুলিকে খেদিয়ে অন্য এক কুলিকে নিলেই হয়। আরো ঠিক বলেছি?

যুবক ॥ হ্যাঁ আরো ঠিক বলেছেন। ভাল কথা, কবে নাগাদ শ্রমিক-অঞ্চলে অস্ত্র পাঠাতে পারবেন বলে মনে হয়?

ব্যবসায়ী ॥ শিগ্‌গির, খুব শিগ্‌গির। আমার নানা ব্যবসা। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন, যে কুলিরা, আমার চামড়ার কারখানায় মোট বয়, তারা ক্যান্টিনে গিয়ে আমারই দোকানের চাল কিনে খায়।

যুবক ॥ সে দেখতে আমাদের বাকী নেই।

ব্যবসায়ী ॥ যে টাকা দিচ্ছি তা যখন ফিরেই আসছে, তখন আপনার কি মনে হয়, মজুরি কি বড্ড বেশি দিয়ে থাকি আমি?

যুবক ॥ একেবারেই না, কারণ চালের দামটা মজুরির চেয়ে চড়া। তার ওপর কাজে ভেজাল থাকলে চলবে না, কিন্তু চালে কাঁকর ভেজাল দিলে দেখছে কে?

ব্যবসায়ী ॥ আপনারা বড় চালাক-চতুর।

যুবক ॥ আর, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কুলিদের হাতে অস্ত্রটা দিচ্ছেন কবে?

ব্যবসায়ী ॥ খাওয়া-দাওয়ার পর ও ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। এবার আমার প্রিয় গানটা আপনাকে শোনাই।

॥ পসরার গান ॥

দক্ষিণে নদীর-ধারেই যত ধানের-ক্ষেত,
আর উত্তরের জেলার লোকের চাল অভিপ্রেত।

সে চাল এনে গোলায় ভরতে ঝরে অনেক ঘাম,
ওপর দিকে লম্ফ তখন মারবেই তো দাম।
যারা টেনে আনে নৌকো বোঝাই করে চাল
তারা যদি কিছু কিছু কম করে খায়
তবেই না চালের দাম খানিক কমানো যায়।

চাল জিনিসটা আদতে কী বলো দেখি!
কখনোও কি ভেবেছি চাল কাকে বলে?
সে সব বুঝবে অন্য লোক বুদ্ধির সব ঢেঁকি।
চাল কাকে বলে আমার না জানলেও চলে!

আমার শুধু জ্ঞাত
চালের বাজার দর কত।

শীত এলেই লোকে আরো কাপড় ক্রয় করে,
তুলো কিনে ঠাসে তখন জামার অন্তরে—
তুলোই বা পথে-ঘাটে থাকে নাকি ছড়িয়ে?
শীত এলে তুলোর দাম দিতেই হয় চড়িয়ে।
তুলোর যারা চাষী তাদের মাইনে যদি কমে,
তবেই তুলোর দামটা কিছু নামে ক্রমে ক্রমে।
তুলো জিনিসটা আদতে……আমার শুধু জ্ঞাত

তুলোর বাজার-দর কত।

মানুষ বড় বেশি গেলে, এত খেলে চলে?
তাইতো তাকে খাটাতে গেলে পয়সা পাখা মেলে।
খাদ্য সৃষ্টি করতে গেলে মজুর ছাড়া চলে না,
রাঁধুনির দোষ নেই বাবা, দাম সে বাড়ায় না,
বাড়ায় যত খাইয়ের দল হাঁড়ি চেটে চেটে
পেটুক শ্রমিক যেথায় যত আমার ঘাড়ে জোটে।

মানুষ জিনিসটা আসলে কী বলো দেখি
কথনো কি ভেবেছি মানুষ কাকে বলে ?
সেসব বুঝবে অন্য লোক বুদ্ধির সব ঢেঁকি।
মানুষ কাকে বলে আমার না জানলেও চলে।
আমার শুধু জ্ঞাত
মানুষের বাজার-দর কত।
আসুন, এবার আমার ক্ষেতের বাসমতী চালের ভাত খাই।

যুবক ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনার অন্ন গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিপ্লবীরা ॥ এই কথা বলে ফেললো সে ; কত বোঝালাম, কত ভয় দেখালাম, কিন্তু যাকে সে ঘৃণা করে তার সঙ্গে একত্রে আহার করানো তাকে দিয়ে হোলো না। ব্যবসায়ীও তাকে বাড়িতে আর ঢুকতে দিল না। কুলিদের হাতে অস্ত্রও আর পৌঁছুলো না।

॥ আলোচনা ॥

সূত্রধার ॥ কিন্তু আত্মসম্মানকে সবার উপরে স্থান দেয়াই উচিত নয় কি ?

বিপ্লবীরা ॥ কক্ষণো না।

সূত্রধার ॥ ঠিক বলেছেন। ভুয়ো আত্মসম্মান আমাদের জন্যে নয়।

॥ দুনিয়াকে বদলে দাও ॥

কারুর সঙ্গে একাসনে বসতে অস্বীকার করা কি সম্ভব কোনো ন্যায়যোদ্ধার,
যদি চরম ন্যায়ের পথ তাতে যায় খুলে ?
যে মুমূর্ষু তার তিক্ত ওষুধে আপত্তি কি হবে গ্রাহ্য ?
নীচতাকে উচ্ছেদ করার পথে নীচতা পরিহার করে চলা কি যায় ?
দুনিয়াকে বদলে দেওয়া কি যায়, অত ভাল মানুষ হয়ে থাকলে ?
কে তুমি সাধুপুরুষ এলে এই সংগ্রামে !
কাদা মাখো গায়ে, দরকার হলে

নরহত্যাকারীকেও করো আলিঙ্গন—
কিন্তু এ দুনিয়াকে বদলে দেয়া চাই,
বদলে দেবার পড়েছে বড় দরকার।
আরো বলুন, কমরেডগণ, শুনতে শুনতে
বিচারকের ভূমিকা ত্যাগ করে হয়ে গেছি শিক্ষার্থী।

বিপ্লবীরা ॥ ভুল করার সঙ্গে সঙ্গেই ভুল বুঝতেও পারলো যুবক কমরেডটি। অনুরোধ করলো আবার যেন তাকে পাঠানো হয় মুকডেন শহরের অভ্যন্তরে। তার দুর্বলতা স্পষ্ট ধরা পড়ে গিয়েছিল আমাদের চোখে, তবু তাকে দরকার ছিল, কারণ বেকার শ্রমিকদের মধ্যে তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং এই সময়ে শোষকের উদ্যত রাইফেলের সামনে প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে সে আমাদের বহু সাহায্য করেছিল পার্টির গোপন সংগঠনে জাল বোনার কাজে।

॥ অপরাধ ॥

বিপ্লবীরা ॥ এর পরের ক'সপ্তাহ ভয়াবহ দমননীতি চললো। আমাদের হাতে বাকি রইল মোটে একটি গোপনকেন্দ্র, যেখানে ছাপাখানা বসিয়ে কাগজ ছাপতে পারি। কিন্তু একদিন সকালে শহর হঠাৎ খাদ্য-বিক্ষোভে ফেটে পড়লো, গ্রামাঞ্চল থেকেও সংবাদ এল খাদ্যের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের। তৃতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা গোপন আশ্রয়টি পাছে বিপন্ন হয় এজন্য আমরা যুবক কমরেডের বাড়িতে মিটিং করতে গেলাম। গিয়ে দেখি বাড়ির বাইরে বৃষ্টির মধ্যে গাদা গাদা বস্তা সাজানো। কথা যা হোলো পুনরাবৃত্তি করে দেখাচ্ছি।

তিন বিপ্লবী ॥ এই বস্তাগুলো কিসের জন্য ?

যুবক ॥ ওগুলো আমাদের প্রচার পত্র।

বিপ্লবীরা ॥ এখানে ফেলে রেখেছ ?

যুবক ॥ তোমাদের কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বেকার শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ওদের যিনি নূতন নেতা তিনি আজ এখানে এসে পৌঁছেছেন এবং আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এই মুহূর্তে অভ্যুত্থান শুরু করা উচিত। এই সমস্ত প্রচারপত্র আমরা বিলি করবো বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের সংকেত-বহ্নি জ্বালবো পৌরভবন দখল করে। উনি পাকা খবর নিয়ে জেনেছেন পৌরভবন আমাদের দখলে এলেই জনতা দেখতে পাবে এই সরকার কত দুর্বল। উনি বলেছেন, আজ রাত্রেই অভ্যুত্থান সম্ভব, এবং আমি ওঁর কথা বিশ্বাস করি।

বিপ্লবীরা ॥ অভ্যুত্থান সম্ভব এ তথ্যের ভিত্তি কী?

যুবক ॥ জনতার দুর্দশা চরমে উঠেছে, শহরে বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিপ্লবীরা ॥ তার মানে যারা এতদিন বোঝে নি, তারা বুঝতে আরম্ভ করেছে মাত্র।

যুবক ॥ বেকার শ্রমিকরা পার্টির শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে।

বিপ্লবীরা ॥ তার মানে তারা সবে শ্রেণীসচেতন হোলো—এখানে অভ্যুত্থানের কথা উঠছে কী করে?

যুবক ॥ নূতন নেতা একজন প্রকৃত সমাজতন্ত্রী। তাঁর মতে বিপ্লবী দাবী দাওয়ার কোনো সীমা থাকতে পারে না। তাঁর বক্তৃতা শুনলে বুঝতে কি বিধ্বংসী শক্তি তাঁর কথায়।

প্রথম বিপ্লবী ॥ তাঁর ডান কানের কাছে একটা কাটা দাগ আছে?

যুবক ॥ হ্যাঁ, চেন তাকে?

প্রথম বিপ্লবী ॥ হাড়ে হাড়ে চিনি। ও বুর্জোয়াদের গুপ্তচর।

যুবক ॥ বিশ্বাস করি না।

বিপ্লবীরা ॥ এখানে আসার পথে দেখলাম কামানশুদ্ধ সৈন্যদল ছুটে যাচ্ছে

পৌরভবনের দিকে। পৌরভবনটা একটা ফাঁদ আর তোমার নেতাটি এক প্ররোচনাদাতা দালাল!

যুবক ॥ না! তিনি নিজে বেকার শ্রমিক, তাই বেকার শ্রমিকদের দুঃখ ওর বুকে বাজে। বেকাররা আর অপেক্ষা করতে পারছে না, আমিও আর বসে বসে আঙুল চুষতে রাজী নই। বড় বেশী দারিদ্র্য চারিদিকে!

বিপ্লবীরা ॥ কিন্তু সংগ্রামীর সংখ্যা বড় কম চারিদিকে।

যুবক ॥ মানুষের দুঃখ শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

বিপ্লবীরা ॥ অভ্যুত্থানের জন্য মানুষের দুঃখই তো যথেষ্ট নয়।

যুবক ॥ কিন্তু মানুষ জেনে ফেলেছে—এই অভাব কুষ্ঠের মতন কোনো রোগ নয়, এই দারিদ্র্য আকাশ হতে ছপ্‌পড় ফুঁড়ে নামে না! ওরা বুঝেছে এই অভাব ও দারিদ্র্য মানুষের সৃষ্টি। ওরা জানে এই অভাব-অনটন সযত্নে প্রস্তুত করা—বুর্জোয়ার রান্নাঘরে তৈরী করা। আর জনতার অশ্রু হচ্ছে সেই ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জনে মশলা। জনতা সব জেনে ফেলেছে।

বিপ্লবীরা ॥ সব জেনে ফেলেছে? আচ্ছা, সরকারের হাতে ক' রেজিমেণ্ট সৈন্য আছে জেনেছে?

যুবক ॥ না।

বিপ্লবীরা ॥ তবে জানবার অনেক কিছু বাকী আছে এখনো। তা অভ্যুত্থানের জন্য যে তৈরী হচ্ছে, তোমাদের অস্ত্র কোথায়?

যুবক ॥ (হাত মেলে ধরে) খালি হাতে লড়বো, দাঁতে কাটবো, নখে আঁচড়াবো।

বিপ্লবীরা ॥ ওতে কিস্যু হবে না। শুধু বেকার শ্রমিকদের দুর্দশা দেখছ, কিন্তু যে শ্রমিকরা কাজ করছে তাদের দুর্দশাটা দেখছ না কেন? শুধু দেখছ শহরটাকে, গ্রামাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি নেই। সৈন্যদের দেখছ শুধু জুলুমবাজ হিসেবে, একবারো দেখছ না যে ওরা হোলো উর্দি-পরা মূর্তিমান দুর্দশা, যাদের জুলুম শুধু হুকুম তামিল মাত্র। তাই যাও

বেকার শ্রমিকদের কাছে, গিয়ে বুর্জোয়াদের গুপ্তচরদের আর তাদের উপদেশামৃতের মুখোশ খুলে দাও, পৌরভবন আক্রমণের পরিকল্পনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করো। ওদের বোঝাও, আজ সমস্ত কারখানা থেকে যে বিক্ষোভ মিছিল বেরুবে তাতেই ওদের অংশগ্রহণ করা উচিত। এদিকে আমরা যাবো সেইসব বিক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট সৈন্যদের কাছে যাদের জড়ো করা হয়েছে পৌরভবনের চারিদিকে, ওদের বোঝাতে চেষ্টা করবো যে উর্দিসমেত ওদেরও যোগ দেয়া উচিত মিছিলে।

যুবক ॥ আমি বেকার শ্রমিকদের প্রতি পদে স্মরণ করিয়ে এসেছি, কতবার সৈন্যরা ওদের ওপরে গুলি চালিয়েছে। আজ আমি কোন মুখে গিয়ে বলবো যে খুনীদের সঙ্গে একত্রে মিছিলে যেতে হবে ?

বিপ্লবীরা ॥ বলবে কারণ সৈনিকরাও ক্রমশ বুঝতে পারছে যে অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের উপর গুলি চালানো ভুল হয়েছিল। ওরাও তো কৃষক পরিবার হতে উদ্ভূত। কমরেড লেনিনের নির্দেশ স্মরণ করো, সমগ্র কৃষকশ্রেণীকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে দেখা ভুল। দরিদ্র কৃষকদের সহযোদ্ধা হিসেবে জয় করে নিতে হবে।

যুবক ॥ আমার প্রশ্ন আছে। মার্কসবাদের মোটা মোটা বইগুলো কি এইকথা বলে, চরম অত্যাচারকে চলতে দেওয়া উচিত, সহ্য করা উচিত ?

বিপ্লবী ॥ মার্কসবাদ আমাদের উপায় বলে দেয় যার দ্বারা প্রতি অত্যাচারের ঘটনাকে তার দেশকালের কার্যকারণের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা যায়।

যুবক ॥ তাহলে মার্কসবাদ একথা বলে না যে প্রতি অত্যাচারের ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ ও সর্বাগ্রে পাল্টা আঘাত হানতে হবে ?

বিপ্লবী ॥ না।

যুবক ॥ তাহলে মার্কসবাদের বইগুলো জঞ্জাল এবং ওদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা উচিত। মানুষ, জীবন্ত মানুষ আজ গর্জন করে উঠেছে !

তাদের জ্বালাযন্ত্রণা আজ পুঁথিগত বিদ্যার বাঁধ ভাঙবে! আমি চললাম সশস্ত্র সংগ্রামে। এক্ষুণি, এই মুহূর্তে—কারণ আমিও গর্জন করে উঠছি, আমি পুঁথিপড়া নীতিকথার বাঁধ ভাঙছি!

[কিছু প্রচার-পত্র ছিঁড়ে ফেলে]

বিপ্লবীরা॥ ছিঁড়ো না কাগজ,

প্রত্যেকটি দরকার, বড় দরকার।
সত্যি কথা শোনবার সাহস আছে তোমার?
তোমার বিপ্লব চট ক'রে হয়, টেঁকে একদিন,
কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে মরে যায় আগামী কাল।
কিন্তু আমাদের বিপ্লব শুরু হয় আগামী কাল,
ওড়ায় বিজয়-কেতন, বদলে দেয় দুনিয়াকে।
তুমি খতম হলেই খতম হয় তোমার বিপ্লব।
তুমি খতম হলেই এগিয়ে চলে আমাদের বিপ্লব।

যুবক॥ শোনো আমার কথা। নিজের চোখে দেখছি এ অত্যাচার আর সহ্য করা চলে না। অপেক্ষা আর ধৈর্যের উপদেশ আমি পদদলিত করছি। আজ রাত্রে বিদ্রোহী বেকার-শ্রমিকদের পুরোভাগে থেকে আমি পৌরভবন দখল করব।

বিপ্লবীরা॥ নির্বোধ, আমরা বলছি পৌরভবন সৈন্যে ঠাসা! তবু যদি অরক্ষিতই থাকত, পৌরভবন দখল করে লাভটা কী, যখন রেলস্টেশন, টেলিগ্রাফ অফিস আর সেনাবাহিনীর ব্যারাক সরকারের হাতেই থাকছে? তোমার কথায় আমাদের একটুও টলাতে পারো নি। সুতরাং বেকার শ্রমিকদের গিয়ে বোঝাও যে একা-একা ওরা এভাবে আঘাত না হানে। পার্টির নামে তোমায় এই নির্দেশ দিচ্ছি।

যুবক॥ পার্টি কে?

সেকি অনেক টেলিফোনে হাত রেখে
বসে আছে কোনো বাড়িতে ?
গুপ্ত চিন্তা আর অজানা সিদ্ধান্ত,
এই কি তার ব্যবসা ?
কে সে ?

বিপ্লবীরা ॥ আমরাই পার্টি,
তুমি আর আমি আর আমরা—আমরা সবাই
তোমার কোটে গাঁথা ফুলে, কমরেড
তোমার মাথার চিন্তায় আছে পার্টি।
যেখানে বাস করি সেখানেই পার্টি গৃহ,
যেখানে তুমি নিপীড়িত,
সেখানে লড়ছে পার্টি।
তোমার পথই যদি সঠিক হয়, কমরেড,
দেখাও সে পথ আমাদের, আমরাও যাবো।
কিন্তু আমাদের ছেড়ে একা-একা তুমি
কোথায় চলেছ, কোন সম্ভাবনার দিকে ?
আমাদের ছাড়াও সঠিক পথও
ভুলের গোলক ধাঁধা।
আমাদের থেকে নিজেকে ছিন্ন করো না কমরেড !
হয়তো আমরাই ভুল করছি,
তুমিই হয়তো ঠিক।
সেইজন্যেই আমাদের থেকে নিজেকে
ছিন্ন করো না, কমরেড !
দীর্ঘ ঘোরানো পথের চেয়ে
সোজা রাস্তা অনেক ভালো,

এ তত্ত্ব কেউ তো কখনো করেনি অস্বীকার
কিন্তু সে সোজা পথের হদিশ পেয়েও
আমাদের যদি না দাও নিশানা,
ব্যর্থ তোমার জানা।
জেনেছ বলেই থাকো আমাদের পাশে
আমাদের থেকে নিজেকে
ছিন্ন কোরো না, কমরেড !

যুবক ॥ হ্যাঁ, আমার পথই সঠিক, তাই বিচ্যুত হতে পারি না সে পথ থেকে। এ অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে, নিজের চোখে দেখেছি।

॥ পার্টির জয়গান ॥

সূত্রধার ॥ ব্যক্তির থাকে দুটি চোখ,
পার্টির আছে সহস্র
পার্টি দেখছে সাতরাজ্যের কাণ্ড,
ব্যক্তি দেখছে একটি ক্ষুদ্র শহর।
ব্যক্তির আছে একটি জীবনলগ্ন,
পার্টির আছে বহু যুগ।
পার্টিকে হত্যা করা অসম্ভব।
কারণ পার্টি জনতার অগ্রণী সৈনিক,
জনতার সংগ্রামে সে দেয় নেতৃত্ব,
হাতে তার মূলগ্রন্থের নিশানা,
যার সৃষ্টি সত্যের উপলব্ধি থেকে।

যুবক ॥ ওসব আর মানি না আমি। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একটি মুহূর্ত ওসব নীতিবাক্যকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কাল পর্যন্ত জানতাম বই-পড়া বুজরুকি ; আজ জীবন্ত মানুষের জীবন্ত কর্মকাণ্ডই শুধু মানি।

সশস্ত্র সংগ্রাম দ্বারে এসে ডাক দিয়েছে। পুরোভাগে থাকব আমি।
আমার হৃদয় বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত! সে বিপ্লব এসে গেছে।

বিপ্লবীরা॥ চুপ করো!

যুবক॥ তোমরাও তো জুলুমই চালাচ্ছ। কিন্তু আমি স্বাধীনতার উপাসক।

বিপ্লবীরা॥ আস্তে কথা বলো, তুমি কি আমাদের ধরিয়ে দিতে চাও নাকি?

যুবক॥ আস্তে কথা কইবো না, কারণ সঠিক পথ ধরেছি।

বিপ্লবীরা॥ পথ সঠিক হোক বেঠিক হোক; সেটা উচ্চনাদে ঘোষণা করলে,
আমরা শেষ হয়ে যাবো! চুপ!

যুবক॥ বড় বেশি দেখেছি, নিঃশব্দে সয়েছি,
আর চুপ করে আমি থাকবো না!
কেন থাকব স্তব্ধ হয়ে?
জনতা যদি না পারলো জানতে
কতশত সহযোদ্ধা তার রয়েছে পাশে,
কিসের শক্তিতে করবে সে বিদ্রোহ?
তাই চললাম আমি জনতার সামনে,
আমি যা ঠিক সেই রূপে,
যা জেনেছি তা বলতে। [মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে]

বিপ্লবীরা॥ দেখলাম তার মুখ, গোধূলির আলোয় সে মুখ।
আবরণহীন সে মুখখানা ছিল খাঁটি মানুষের,
প্রকাশ্য সারল্যের প্রতিচ্ছবি।
মুখোশ ছিঁড়ে ফেলেছিল সে।
ঘর থেকে ঘরে উঠলো কলরোল
ওরই বড় প্রিয় শোষিতদের কণ্ঠে,
নিদ্রিতদের নিদ্রাভঙ্গ কে করেছে বেয়াদপ?

খুলে গেল একটি জানালা, চীৎকার জাগলো তীক্ষ্ণকণ্ঠে :
কয়েকটা বিদেশী শয়তান ! ধরো রাজদ্রোহীদের !
দেখে ফেললো আমাদের।
সঙ্গে সঙ্গে কামান এলো শহরের কেন্দ্রস্থলে
কামানের মেঘগর্জন।
নির্বোধরা চেচাঁলো : এখুনি লড়াই, নইলে হবে না।
নিরস্ত্ররা চেঁচালো : ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এস, লড়াই হবে।
যুবক কমরেডও প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে
করতে লাগলো চীৎকার, থামলো না কিছুতেই।
তখন প্রহারে ওকে ধরাশায়ী ক'রে,
সংজ্ঞাহীন দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে,
দ্রুতপদে সে রাস্তা ছেড়ে পালিয়ে গেলাম আমরা।

৭ ॥ পলায়ন ॥

সূত্রধার ॥ শহর ছেড়ে পলায়ন করলেন ?
শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ
আর নেতৃত্ব শহরসীমা ছেড়ে পলায়মান ?
আপনাদের শাস্তি দেওয়া হবে না কেন বলতে পারেন ?

বিপ্লবীরা ॥ দাঁড়ান, দাঁড়ান !
গোলাগুলির আওতা থেকে বহুদূরে দাঁড়িয়ে,
মাসখানেক ভেবেচিন্তে সবজান্তা সাজা সহজ
কিন্তু আমাদের ছিল পাঁচটি মিনিট সময়,
আর রাইফেলের পাল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে
চিন্তার দায়িত্ব।

শহরের বাইরে চুনের পরিখাগুলির কাছে এসে শুনতে পেলাম শহরের যুদ্ধে আমাদের বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদ। আমাদের যুবক-কমরেড কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনলো পৌরভবনের দিক থেকে ভেসে আসা কামানের নির্ঘোষ, বুঝলো কী সে করেছে, বললো: আমাদের সব শেষ হয়ে গেল। আমরা বললাম: সব শেষ হয়নি মোটেই, হতে পারে না! কিন্তু ওকে তখন চিনে ফেলেছে সবাই, ওর পলায়নের পথ রুদ্ধ। নদীতে ভাসছে যুদ্ধ জাহাজ, রেলের বাঁধের উপর প্রহরারত সাঁজোয়া ট্রেন। আমাদের একজনকে চিনতে পারলে সবাই তো গ্রেপ্তার হবে! ঠিক করে ফেললাম—ওদের অতি পরিচিত যুবক-কমরেডটি ধরা পড়ে পুরো গোপন সংগঠন বিপন্ন হবে, এ আমরা হতে দেব না।

সূত্রধার ॥ যেখানেই আমরা দেখা দিই,

লোকে জানতে পারে, শাসকশ্রেণীকে
শেষ করে দেয়া উচিত।
তাই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যর্থ হুংকার ক'রে মরে।
যেখানে ক্ষুধিতরা চাপা গর্জনে
আঘাত ফেরাতে হয় উদ্যত,
সেখানেই চীৎকার ক'রে ঘাতক-জল্লাদের দল,
কমিউনিস্টরা টাকা দিয়ে করাচ্ছে গর্জন,
কমিউনিস্টদের টাকা খেয়েই এই প্রতিরোধ।
আমাদের ললাটে অতি স্পষ্ট লিখন—
আমরা শোষণের শত্রু।
যে পরোয়ানায় গ্রেপ্তার হই দলে দলে
তাতে লেখা শুধু এই—
এরা শোষিতের বন্ধু।
হতাশায় আচ্ছন্ন মানবের পাশে এসে দাঁড়াবে যে

সেই হবে ওদের জগতের ঘৃণ্য জঞ্জাল।
হ্যাঁ, আমরা ঘৃণ্য জঞ্জাল, সেটাই গৌরব।
তাই ধরা পড়ে যাওয়ার বিলাসিতা আমাদের নয়।
তখন আপনারা সমস্যার কী সমাধান করলেন ?

৮ ॥ সমাধান ॥

বিপ্লবীরা ॥ আমরা সিদ্ধান্ত করলাম—
যুবক কমরেডকে একেবারে নিরুদ্দেশ হতে হবে।
যেহেতু আমাদের ফিরে যেতে হবে কাজে,
আর যেহেতু ওকে সঙ্গে নেয়ার উপায় ছিল না কোনো,
অথচ বিপজ্জনক একা ফেলে রেখে যাওয়া, তাই ভাবলাম
গুলি ক'রে মেরে চুনের গর্তে ফেলে যাওয়াই হচ্ছে পথ,
যাতে মৃতদেহও দগ্ধ হয়ে মিশে যায় মাটিতে।
সূত্রধার ॥ আর কোনো পথ পান্ নি খুঁজে ?
বিপ্লবীরা ॥ ঐটুকু সময়ের পরিসরে আর কোন পথ পাই নি।
পশুরা যেমন অন্য পশুর বেদনায় হয় অধীর,
তেমনি ব্যাকুলচিত্তে ভেবেছি কা করে বাঁচাই ওকে
যে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়েছে একই আদর্শ নিয়ে।
পার্টির চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
পাঁচটি মিনিট ভাবলাম একের পর এক
এর চেয়ে ভাল পথ যদি কিছু থাকে।
আপনারা ভাবুন তো এখন, বার করতে পারেন কিছু ?

[নীরবতা]

তাই সিদ্ধান্ত নিলাম।
নির্দয়ভাবে নিজেদের প্রত্যঙ্গ একটিকে

দেহ থেকে এক কোপে কেটে ফেলার সমাধান।
হত্যা করা বীভৎস জিনিস,
কিন্তু সারা দুনিয়ার লোক জানে,
কমিউনিস্ট শুধু অন্যকে নয়, নিজেকেও পারে হত্যা করতে হাসিমুখে,
যদি দুনিয়াটাকে বদলে দেওয়ার কাজে লাগে
সেই হত্যা থেকে নিঃসৃত শক্তি।
তাই বললাম আমরা, হত্যা না করার
কোনো অধিকারই নেই আমাদের।
অনমনীয় মন নিয়ে, কালান্তরী বিপ্লবের স্বার্থে
গ্রহণ করলাম কঠিন সমাধানের পথ।

সূত্রধার॥ আরো বলুন! আমার সমবেদনা আপনাদের জন্যে রইল।
যা সহজ সঠিক পথ তা গ্রহণ করা তো সহজ নয়।
আপনারা ওকে দণ্ড দেন নি, কমরেড, দিয়েছেন
বাস্তব সম্ভাব্যতার শেষ সাম্যবাদী শিক্ষা।

বিপ্লবীরা॥ শেষ সংলাপটা পুনরভিনয় করে দেখাচ্ছি।

প্রথম বিপ্লবী॥ যেহেতু সাহসের অভাব তার হয়নি কখনো সংগ্রামের ক্ষেত্রে,
তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে রাজী কিনা।

দ্বিতীয় বিপ্লবী॥ রাজী না হলেও অবশ্যই তাকে শেষ করে দিতেই হোতো।

প্রথম বিপ্লবী॥ (যুবক কমরেডকে) যদি ধরা পড়ো, ওরা তোমায় গুলি করে মারবে। আর যদি তোমায় চিনে ফেলে, আমাদের সমস্ত কাজ বিপর্যস্ত হবে। তাই আমরাই তোমাকে গুলি করে মারতে বাধ্য হচ্ছি, গুলি করে এই চুনের গর্তে দেহ ফেলে দিলে দ্রুত সেটা ক্ষয়ে যাবে। তার আগে প্রশ্ন করছি, তুমি কি অন্য উপায় বলতে পার?

যুবক॥ না।

বিপ্লবীরা ॥ তাহলে জিজ্ঞেস করছি, তুমি রাজী ?

[নীরবতা]

যুবক ॥ হ্যাঁ। আমি বুঝতে পেরেছি আমি আগাগোড়া ভুল করে এসেছি।

বিপ্লবীরা ॥ সব সময়ে নয়।

যুবক ॥ চেয়েছিলাম কাজে লাগতে, আর এনেছি শুধুই বিপর্যয়।

বিপ্লবীরা ॥ শুধুই বিপর্যয় নয়।

যুবক ॥ তাই এখন এই ভাল, মরলেই এখন কাজে লাগবো।

বিপ্লবীরা ॥ হ্যাঁ। নিজেই করতে চাও কাজটা ? সরে যাবো আমরা ?

যুবক ॥ আমার সাহায্য করো।

বিপ্লবীরা ॥ আমাদের বাহুতে মাথা রাখো, কমরেড, চোখ বোঁজো।

যুবক ॥ সাম্যবাদের স্বার্থে, সারা দুনিয়ার সর্বহারার বিজয় অভিযানকে সমর্থন জানাবার জন্য, সারা দুনিয়ার বিপ্লবের নাম মুখে নিয়ে—

বিপ্লবীরা ॥ গুলি করলাম ওকে,

দেহটা ফেলে দিলাম চুনের পরিখায়।

চুনের রাশি গ্রাস করলো আমাদের কমরেডকে,

আর আমরা ফিরে গেলাম আমাদের কাজে।

সূত্রধার ॥ আপনাদের কাজ সফল হয়েছে।

আপনারা ছড়িয়ে দিয়েছেন মার্কসবাদের শিক্ষা,

সাম্যবাদের গোড়ার কথা,

অজ্ঞানকে দিয়েছেন উপলব্ধি,

শোষিতকে শ্রেণীচেতনা, শ্রেণীসচেতনকে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা।

চীনে বিপ্লব এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে,

উঠে দাঁড়াচ্ছে শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রামীর দল।

আমরা আপনাদের সমাধানকে সমর্থন করছি।

আপনাদের কাহিনী চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে
এ দুনিয়াকে বদলে দিতে গেলে কী কী লাগে
ক্রোধ, একাগ্রতা, জ্ঞান, বিদ্রোহী চিত্ত,
দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষিপ্রতা, গভীর চিন্তায় স্থৈর্য, •
নিরুত্তাপ সহ্যশক্তি, অসীম অধ্যবসায়,
একক ও সমগ্র—বিশেষ ও সাধারণ—দুই-ই উপলব্ধির ক্ষমতা।
বাস্তবকে সম্যক বুঝে, তবেই না পারবো
বাস্তবকে আমূল বদলে দিতে।

রাত কবে শেষ হবে

সুনীল দত্ত

প্রথম অভিনয়

২৪ পরগণা লোক উৎসব

নাম ভূমিকায়—সুনীল দত্ত

সংগীতে : হাবু লাহিড়ী

সহযোগিতায় : মানবেন্দ্র পাল

[পর্দা উঠতে দেখা গেল, মঞ্চের সম্মুখে একটা টেবিল পাতা আছে। টেবিলে একটা সাদা চাদর পাতা আছে, তার উপরে একটা ফুলদানীতে কিছু রজনীগন্ধার গুচ্ছ। পেছনে কয়েকটা পোষ্টার লেখা আছে। "নেশার ঘোর থেকে মুক্ত হোন," "সহজ ভাবে বাঁচবার চেষ্টা করুন," "মাদক দ্রব্য বর্জন করুন"। একজন ৫০ বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোক প্রবেশ করেন। ভদ্রলোকের পরনে ধুতি ও পাঞ্জাবী, তার উপর একটা কোট। নেপথ্যে যন্ত্র সঙ্গীত বাজতে থাকে।]

ভদ্রলোক ॥ (বিরক্তির সংগে) আ-হা বাজনাটা থামান না, আমি তো এসে গেছি। নমস্কার! একটু দেরী হয়ে গেল, প্রথমেই আমি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আপনারা একেবারে ঠিক টাইমে আসবেন, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি একজন বাঙালী, আমার ধারণা ছিল আপনারাও বাঙালী। যাই হোক এ যাত্রায় মার্জনা করে দেবেন।

আজকের এই সভায় (ঈষৎ গলা খাঁকারি) আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেবার কথা ছিল, অবশ্য আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি, যদি আপনাদের শোনার ধৈর্য্য থাকে।

আমি মশায় কেউ-কেটা কেউ নই, বাজারে নাম-ডাকও নেই। আমার ক্ষেত্রে রিফিউজি—(থেমে) কথাটা ব্যবহার করা যায় কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। আসলে ঠিক পাকিস্তান থেকে'ত আসিনি। এসেছি সদ্য উত্তর বাংলা থেকে। ঐ তিস্তার বানের জলে ভাসতে ভাসতে এই পশ্চিমবাংলায় এসে ঠেক খেয়েছি। ভাবছেন উত্তরবাংলার বন্যার বীভৎসতা আপনাদের কাছে তুলে ধরে পকেটে হাত দোব, না—না, সে ভয় নেই! তাছাড়া, ও ব্যাপারে আমি কতটকুই বা বলতে পারব মশাই? যেখানে দেশের বড় বড় নেতারা জ্বালাময়ী ভাষা দিয়ে হরদম বলছেন, চাঁদা তুলছেন। আসলে আমার বলার বিষয় হচ্ছে, "মাদক দ্রব্য বর্জন করা উচিত," ঐ নেশা—নেশা জিনিসটা আমাদের সমাজ জীবনে কি কি ক্ষতি করে! আমার পেশা হচ্ছে "ব্রোকারী" করা, ভদ্রভাষায় কেউ কেউ বলেন "সেলসম্যান", চলতি ভাষায় বলেন, "দালাল"। তবে শেষেরটা বলবেন না দয়া করে। কারণ, ঐটেই আমাদের অরিজিন, মানে বৈশিষ্ট্য কিনা। নিজেকে বাঁচাবার জন্য, সংসারকে বাঁচাবার জন্য নাম লিখিয়েছি ঐ দালালির খাতায়। ঐ খাতা থেকে কোনদিন নাম মোছা যাবে কিনা জানিনা! অবশ্য অন্য কোনও খাতার উপর তেমন বিশ্বাস আমার নেই। আরে আমরা তো ঘড়ির পেণ্ডুলাম, দুলছি, দুলছি আর দুলছি। এই দুলতে দুলতে কোনদিন দেখবেন, শুধু পা-টা দুলছে, বাকীটা অসাড় হয়ে গেছে। আমার কিন্তু আজ মোটেই বলার ইচ্ছে ছিল না।

সত্যি কথা বলতে কী এ কারবারটা আমার ঠিক রপ্তও নেই। এই এই বক্তৃতা-বাজির জন্যে শুনেছি অনেক বই-টই পড়তে হয়। আমার মশাই ওসব পড়াও নেই, দরকারও নেই। আসলে—(পিছনের দিকে তাকিয়ে) আসছে না তো? না। (চাপা গলায়) আসলে আমার স্ত্রী ইদানীং কোলকাতায় এসে পাঁচ পাবলিকের সঙ্গে একটু মেলামেশা

করছে কিনা, তাতে পেটটা অবশ্য দুবেলাই ভরছে। (হাসি) আমার সম্বন্ধে লোকে নাকি আমার স্ত্রীর কাছে বলেছে—আমি একটা উজবুক। (হাসি) হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ। তারই একমাত্র ছোট বোন ছবি, এই (মুচকি হেসে) বছর কুড়ি বয়েস। সেও বলে, জামাইবাবু আপনি দিন দিন কেমন যেন জড়ভরত মেরে যাচ্ছেন,··· আর একটু স্মার্ট, একটু স্লিম হবার চেষ্টা করুন না! সে আবার আমার সামনে যে জামাটা পরে আসবে তার গলায় পাঁচ ইঞ্চি ছাঁটা, কোমরে চার ইঞ্চি কাটা, আর হাতে—না হাতা নেই। আর শাড়ীটা এক ইঞ্চি ডাউন-মানে নামিয়ে পরেন। অবশ্য এখন বেশী নামেনি, মাত্র এক ইঞ্চি। তবে সভ্যতার অগ্রগতির তালে তালে শাড়ী আর ক'ইঞ্চি নামবে, ব্লাউজ আরো ক'ইঞ্চি উঠবে, আমার পক্ষে বর্ণনা করা বড়ই কঠিন। ওটা আপনারাই কল্পনা করে নিন।

ব্যাপারটা কি জানেন, সেই অজ জঙ্গল থেকে সদ্য সহরে এসেছি তো, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা আমি কলকাতাতেই আছি না মার্কিন দেশের ছোট একটা সংস্করণ এমনি কোথাও আছি। যাক্ মেয়েদের নিয়ে বেশী বলা ঠিক নয়, কি বলুন! তাহলে আবার আমার ছবি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে! বুঝুন এই ৫০ বৎসর বয়সে অমন ফুটন্ত ফুল পাওয়া সৌভাগ্যের কথাই বলতে হবে এ্যাঁ; হেঃ···হেঃ... হেঃ (একটু থেমে) ঐ···ঐ...ঐতো পায়ের শব্দ, ঐ ছবি বোধ হয় আসছে! না···না...স্ত্রী আসছে! স্ত্রী যদি শেষের কথাটা শুনে থাকে তাহলে তো এখানেই একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যাবে। ওরে বাবা, আমি মশাই বাঘিনীর মতো ভয় করি তাকে? (ভাল করে দেখে নেয়) না···না, আমার স্ত্রীর হাঁটার মধ্যে থপ্ থপ্ থপ্ থপ্ করে আওয়াজ হয় মানে একটু হস্তিনী টাইপের। হেঃ···হেঃ...হেঃ তবে একতরফা তো চিরকাল কিছুই হয় না। ধরুন, এমন দিনও গেছে,

আমি নেশা করে চুর হয়ে ঘরে ঢুকেছি। ঘরে বৌ শুয়ে আছে, চুলের মুঠি ধরে ওপরে উঠালাম, তারপর এইসান মারলাম সাটিয়ে দুগালে ঠাস ঠাস করে চড়। গিয়ে ছিটকে পড়ল একেবারে নীচের। তারপরেই আমি একেবারে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা। খাবার-লেয়াও! মানে ঐ যন্ত্রণাকে বেশীক্ষণ উপভোগ করতে সময় দিলাম না। একেবারে হের হিটলার।

কেন আসবেনা স্ত্রীর প্রতি বিতৃষ্ণা বলুন তো! সে কি একটা দিনও আমায় আনন্দে থাকতে দিয়েছে! একটা দিনও কি (বলতে বলতে চোখ ছলছল করে) ঘরে আমি শান্তিতে থাকতে পেরেছি। আজ আটাশ বছর বিয়ে হয়েছে আমাদের আর এই আটাশটা বছর দুঃখের ঘানি টানতে টানতে আমার ঘাড় বেঁকে গেছে, দিনে দিনে আমি যে কুঁজো হয়ে যাচ্ছি এটুকু দেখার চোখ পর্যন্ত কারো নেই! শুনেছি সতী সাবিত্রী সত্যবানের জন্য যমের দোর পর্যন্ত হানা দিয়েছে। আর, আমি, আমি মরে গেলে বোধহয় আমার বৌ চোখের জলও ফেলার সময় পাবে না। (হঠাৎ থেপে গিয়ে) নুন নেই, তেল নেই, চাল নেই, চিনি নেই এই করতে করতে জীবনের সব কটা দিন পার হয়ে গেল। ২৫ বছরে যে আমি ভাল কবিতা লিখতুম, আজ ৫০শে এসে সে সব ভুলে গেছি। আমারও যে একটা কলম ছিল। আমারও যে কিছু বলার ছিল, আমি সব একে একে ভুলে গেছি। বিশ্বাস করুন আমারও মধ্যে ছিল পরিপূর্ণ একটা শিল্পীসুলভ মন। সেই মনটাকে আমি দারিদ্র্যের হাটে কখন যে বিক্রি করে দিয়ে এসেছি তা আমি নিজেই জানি না। তাই আমি আজ নিঃস্ব, তাই আমি আজ সর্বস্বান্ত। (ভেঙে পড়ে)

আমি একটু বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলেছি, তাই না? যাক্ যা বলছিলুম, ঐ মদ খাওয়া আমাদের দেশে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। ঐ

নেশা...দাঁড়ান, আমি একটু ওষুধ খেয়ে নিই। আমার আবার একসঙ্গে অনেকগুলো রোগ আছি কিনা। (পকেট থেকে একটা অষুধের শিশি বের করে একদাগ একটা গ্লাসে ঢেলে খেল।) আচ্ছা, আপনাদের বিরক্ত লাগছে নাতো, ঐ গরম গরম ভাষা দিয়ে বলতে পারছি না বলে! দেখুন আমি ছাপোষা মানুষ, আমার ছ'টা মেয়ে আর একটি মাত্র ছেলে।

কি বলবো দুঃখের কথা, মেয়ে ছটির সব কটিই আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে। সব কটিই আমার চোখের সামনে যেন আগুনের মতো দপ্ দপ্ করে জ্বলছে, আর জ্বলছে আমার স্ত্রী, আমার শালী সব কটিই। ঐ তিস্তার বান তাদের একটাকেও শেষ করতে পারেনি। তাদের একটার গায়েও আঁচড় কাটতে পারেনি। কিন্তু ঐ রাক্ষসী তিস্তা আমার আঠার বছরের ছেলে অরুণকে নির্মমভাবে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমার ভবিষ্যৎ, আমার একমাত্র প্রদীপের সলতেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঐ ভয়ঙ্করী তিস্তা—রাতের অন্ধকারে আমার ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে গেল ঐ সর্বনাশী তিস্তা।

বন্যা নিয়ে অবশ্য আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু না বললেও যে পারছি না। কি করব বলুন তো? এত নোংরা আবর্জনা এই এইখানটায় (বুক দেখিয়ে) জমে আছে। আচ্ছা এমন একটা বন্ধু পাওয়া যায় না যাকে সব উজার করে বলা যায়। যে আমার ঐ নোংরা আবর্জনাগুলো নিয়ে নতুন করে আর কারবার খুলবে না, নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য আমার বউ বা মেয়ের সঙ্গে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে অন্য কারুর কাছে আমার কেচ্ছা গেয়ে বেড়াবেনা? আজ... আমি যখনি একটা সুযোগ পেয়েছি কিছু না বলে যেতে পারবোনা। কারণ, আজ একটা শেষ-বেশ করতেই হবে যে!

[শিশি থেকে আবার এক ডোজ ওষুধ গ্লাসে ঢেলে খেল]

অতো সিরিয়াস না হওয়াই ভাল, কি বলুন। আসল ব্যাপার কি জানেন, আপনি যতো গভীরভাবে আপনার জীবনকে জানতে চেষ্টা করবেন, মরণ ততো আপন হয়ে কাছে······আরো কাছে আসবে। একবার ভাববার চেষ্টা করুন, দিনের পর দিন নির্যাতন আর নিস্পেষণ চালাচ্ছে ঐ ধনিক শ্রেণীর দালালরা, থুরি—দালাল বলা ঠিক নয়। ওটা করলে কোন দোষ নেই, বললেই যতো দোষ। তাদের বদলা হিসেবে আপনি শুধু একবার রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করুন, দেখবেন, আপনার পেটে ভাত আর নুন না জুটলেও সিসের গুলিটা ঠিক এসে বিঁধবে। তখন হবেন আপনি বিপ্লবী, বিদ্রোহী কিম্বা দেশদ্রোহী নয় তো হঠকারী।

আবার রাজনীতির মধ্যে চলে যাচ্ছি। আমরা সাধারণ মানুষ, ওটা আমাদের ঠিক মানায় না। অবশ্য আমার ছেলেটা ঐ লাইন দিয়েই হাঁটতো। আমি বারণ করিনি। আরে আমার নামতো অন্য খাতায় লেখাই আছে। ও যদি কিছু করতে পারে তো আমি আর বাধা দিই কেন বলুন তো? তবে মশাই আপনি রাজনীতি করুন আর নাই করুন, একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন যে আপনি রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুল হয়ে ঘুরছেন। বন্যায় ভাসতে ভাসতে আমি তা বুঝেছি। হ্যাঁ, বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে আমি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের দেখতে পাই আর না পাই ঐ রাজনৈতিক নেতাদের ঠিক দেখা পেয়েছি। ধরুন না কেন, আমাদের স্বনামধন্য নেতা, তিনি ওখানে আসর জাঁকিয়ে বসে বল্লেন, "আমি যাবনা, দেখি আমাকে তাড়ায় কে"? অবশ্য বেশীদিন টিকতে পারলেন কই? ঐ গরু-বাছুর আর মানুষের মরদেহগুলো পচে ফুলে এমন 'গ্যাস বের হচ্ছিল, ভদ্রলোককে ত্রাহি ত্রাহি রবে সোজা রাঁচিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হলো। অবশ্য যাবার আগে একটা কড়াভাষায় বক্তৃতা দিতে

ছাড়েননি। যে আসে যে যায় সবাই ঐ একই কথা বলে —"ঐ গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে আমাদের একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে"! আমার ছেলে বলতো, "না বাবা, ওদের গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম আমাদের নয়।" "আমাদের বাঁচার সংগ্রাম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।" ঐ যে একটা কবিতা আছে না—

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ
চায় শুধু ভাত একটু নুন,
সারাদিন বাছা খায়নিকো কিছু
কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।

আমার ছেলে বলতো "স্বাধীনতা" শব্দের সত্যিকারের অর্থ যদি কোথাও থাকে তা'হলে এই ক' লাইন কবিতার মধ্যেই আছে। এই মরেছে, আবার কোন ফাঁকে রাজনীতির গ্যাঁড়াকলে জড়িয়ে পড়েছি রে! দেখুন, এই লাইনকটাকে আমি ভীষণ ভয় করি।

তা'হলে বলি শুনুন। একবার আমার এক লেখক বন্ধু বলল, দেখ্ আমার একটা বই ছাপা হচ্ছে, তাতে তোমার নামটা প্রকাশক হিসাবে ছাপবো। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কোন পাওনাদার আমার ঘাড়ে এসে চাপবে না তো"? সে বলল—না. না সে ভয় নেই। আমি কিন্তু মনে মনে খুব খুশী হয়েছিলুম। আরে মশাই ছাপার অক্ষরে নামটা তো অন্ততঃ বেরুবে, এ্যাঁ। তারপর সেই বই যখন হাতে পেলুম তখন স্ত্রীর উপরই প্রথম দৃষ্টি আরম্ভ করলুম, দেখ, আমি শুধু মোদো মাতাল-ই নই, আমার নাম ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে। গিন্নী তো সেই বই নিয়ে দুনিয়ার মেয়েদের কাছে দেমাক দেখাচ্ছিল, দেখ, আমার স্বামীর নাম. ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে। তারপর একদিন গভীর রাতে হাজির হল পুলিশ, সঙ্গে এক দল লোক। আমি ভাবলুম বইটা বোধহয় কোন প্রাইজ টাইজ পেয়েছে, আমায় নিয়ে যেতে এসেছে

টাকা দেবার জন্য। মনে মনে খুব খুশী হয়েছিলাম। পুলিশের কর্ত্তা বললেন, "এই বই আপনি ছেপেছেন" ? আমি গদগদ স্বরে বললুম হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন,"আপনাকে থানায় যেতে হবে, আপনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ছেপেছেন কেন ?আ·······আমি, আগে তো পড়ে দেখিনি, ও সব বি...বিপ্লব টিপ্লব...ওরে বাবা ! পুলিশ তখন নিজ মুর্ত্তি ধারণ করে বলল, বানচোত, নেঁকা সাজার আর যায়গা পাওনি।" তারপর মশাই আমার ঘর হতে গীতা থেকে রামায়ণ, মহাভারত এমনকি স্ত্রীর উল্টোরথ, সিনেমা -জগৎ পর্য্যন্ত জোর করে নিয়ে চলে গেল। প্রথমে নিয়ে গেল থানায়, পরে জেলে। সেখানে গিয়ে দেখি লেখকও বসে আছে ঐ একই সেলে। যাই হোক, বছরখানেক বাদে তো ছাড়ান পেলাম। তারপর মশাই, সেকি সংবর্ধনা, পাড়ায় পাড়ায় ডাক আসছে বক্তৃতা দেবার জন্য "আজকে -র রাজনীতি" "বর্ত্তমান সরকারের চরিত্র" নানান বিষয়ে বলতে হবে।

একজন জ্যোতিষী উপদেশ দিলেন, তোমার তুঙ্গে বৃহস্পতি, রবি সহায়, এই সুযোগে বিখ্যাত মনীষীদের কিছু কোটেশান মুখস্থ করে নিয়ে বক্তৃতা দাও, তোমার নেতা হবার চান্স এসেচে। সত্যি কথা বলতে কি রাতা-রাতি ফোকটে নেতা বনে গেলুম। একটা করে ফুলের মালা আনি আর স্ত্রীর গলায় পরিয়ে দিই, স্ত্রীর সেকি অবস্থা। ভালবাসার বহর প্রায় নব্বুই ডিগ্রী বেড়ে গেল। হলে কি হবে ? ঐ "বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা" আর "পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা"। তারপর থেকে আরম্ভ হলো, কোথায় নক্সালবাড়িতে কি হয়েছে তাতে আমি। আমি নিজে যার কোন খোঁজ রাখিনা—আমি না জানলে কি হবে, পুলিশ এসে হাতে দড়ি দিয়ে নিয়ে গেলো। বলে, শালা ওর মধ্যে আছে। এই ফাঁকে শালাও বলে নিল। তারপর থেকে যেখানে যাই হোক তার নেতৃত্বে আমি নাকি আছি। তখন আমি থানায় গিয়ে বললুম, "হে ধর্মাবতার, আপনি হচ্ছেন আমার মা বাপ আমি হচ্ছি শুয়রের বাচ্ছা; দয়া করে আমার নামটা স্বদেশীর

রেকর্ড থেকে বাদ দিয়ে চোর-চোট্টা-চিটিংবাজদের খাতায় ট্রান্সফার করুন। আগের লাইনটা আমার রপ্ত নেই। তখন একটা বিশ্বাস ছিল কি জানেন, ওদের ধরতে হলে তো সেই ওপরওয়ালা থেকেই ধরতে হবে। তাই ও লাইনে সহজে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না। কিন্তু কি বলব মশাই! একেই বলে কালের ফের! কোথায় কালো গাড়ী করে কে ডাকাতি করেছে, আমি নাকি তার সঙ্গে আছি। আমি তখন বললুম, হুজুর গাড়ী আমার দুটো —এক বাস গাড়ী দুই রেল গাড়ী। (একটু থেমে) ঐ যাঃ, মাপ করবেন, ভুল করে অন্য লাইনে চলে যাচ্ছিলাম, ঠিক লাইনের লোক ত নই, তাই সব সময় আউট লাইন হয়ে যাই। এই মাইকের সামনে এলেই আমি অমায়িক হয়ে যাই। (হাত দুটো গৌরাঙ্গের মতে তুলে খুশির হাসি হাসে; পরমুহূর্তেই হাতের দিকে চোখ পড়ে যেতে লজ্জায় পড়ে যায়, কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে)।

কিছুদিন আগে ধর্মতলা থেকে বাসে উঠলাম যাব শোভাবাজার। সঙ্গী হলেন আরো দু'জন, অবশ্য তারা মাতাল। একজন আরেকজনকে বলছে,"আমার স্ত্রীকে আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি; তোমার ক্যারেকটার আমি দেখবো, আমার ক্যারেকটার তুমি দেখবে। তারপর আমাকে বললো, বলুন দাদা, ইস্ত্রীকে আমি পুজার সময় গয়না দিই, শাড়ী দিই, আমি কি পরি? তবে অমি একটু খাই! কিন্তু তোমার ক্যারেকটার আমি দেখব, আমার ক্যারেকটার তুমি দেখবে। তুমি যে লিপিষ্টিক মাখো, রুজ মাখো, আমি কি মাখি? কিন্তু তোমার ক্যারেকটার আমি দেখবো, আমার ক্যারেকটার তুমি দেখবে। না—না, অপনিই বলুন দাদা তোমায় যে পুজায় হাতে বালা পায়ে মল পরাই, আমি কি পরি? আমি একটু খাই। কিন্তু তোমার ক্যারেকটার আমি দেখবো, আমার আমার ক্যারেকটার তুমি দেখবে। এই কথা বলতে বলতে গরাণহাটা স্ট্রীট এসে গেছে ভদ্রলোক নামতে গেছেন; তখন দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন

এখানে নামছেন কেন ? উনি বলে গেলেন, আমি গরাণহাটা হয়ে শোভা বাজার যাই। তখন পাশের ভদ্রলোক বললেন, বুঝলেন যা, উনি নিজের ক্যারেকটার ঠিক রেখে বাড়ী যাবেন, তারপর স্ত্রীর ক্যারেকটার দেখবেন। আমি শুধু বললাম ওঃ।

এই ধরুন না কেন, যে নাম দেখে আপনারা এসেছেন ওটা আদৌ আমার নাম নয়। যদি আমার বাবার দেওয়া নামটি শুনতেন এবং তারপরেই আমার বদনখানি দেখতেন, তাহলে কিন্তু আপনারা আঁৎকে উঠতেন, হেসে গড়াগড়ি যেতেন। বাবার দেওয়া নামটি ছিল নদের চাঁদ পলুই। আমার বাবা যখন আমর চরিত্র মানে ক্যারেকটার রক্ষার জন্য ধরে করে একটা বিয়ের ব্যবস্থা করলেন, তখন আমার স্ত্রী আমার নাম শুনে কল্পনা করে নিয়েছিল, দেখতে আমি কত না সুন্দর। তারপর মশাই, সেই শুভদৃষ্টির সময় যেই না সে আমায় দেখেছে, " ও মাগো" বলে ছিটকে গিয়ে পড়েছে পিঁড়ে থেকে একেবারে নীচেয়। তখন আমি শুধু কবিগুরুর একট গানের কলি আউড়েছিলাম :

> না যেওনা, যেওনা গো,
> মিলন পিয়াসী মোর কথা রাখ, কথা রাখ।

অবশ্য প্রথমে আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমাদের পুরোহিত আমাকে পিঠ চাপড়ে বলল, ঘাবড়াচ্ছো কেন হে— এঁ্যা। হিন্দু মতের এমনই কড়াশাসন, একবার যখন পিঁড়িতে বসেছে বাছাধন, তখন আর ছিটকে যাবার পথ নেই, হেঁ— হেঁ…হেঁ। হলও তাই। অবশ্য বিয়ের পর সামলে নিয়েছি চাঁদির গুণে। যখনই কোন সুন্দর ছেলে দেখে ভেঙে চলে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের দোকানে ঢুকিয়ে একটা শাড়ি কিনে দিয়েছি। তারপরই একগাল হাসি। ঐ কাউকে দেখে একবার হু-হু, হা-হা করলেই একটা গয়না, নিদেনপক্ষে একটা ব্লাউজ। তারপর থেকেই সে আমায় বলতো, ওগো, তুমি যে আমার অন্ধকারের আলো। (একটু

থেমে) ঐ···ঐ···ঐতো পায়ের শব্দ ! নিশ্চয়ই সে আসছে। দোহাই আপনাদের—আপনাদের মধ্যে যার মুখটি একটু সুন্দর তিনি অন্ততঃ একবার মুখটি ঢেকে রাখুন। নাহলে এক্ষুণি আমাকে আবার একটা শাড়ীর দোকানে ঢুকতে হবে। (একটু বাদে হাফ ছেড়ে) না···না, এখনো আসেনি। মনের মতো সাজা হয়নি হয়তো! ছেলেধরা সাজ কিনা! তাই একটু ভাল ভাবেই সাজছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দাঁড়ান, এক মিনিট। (এক ঢোক ওষুধ খেল) এই মদ খাওয়াটা খারাপ, এটা যেমন সত্য, আবার মদ অনেক সময় থেকে হয় এটাও তো আমাদের জানা দরকার। ধরুন, কারখানা থেকে বেরুনোর পথে প্রথমেই চোখে যা পড়বে, তা হচ্ছে এই মদের দোকান। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর যাতে এই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মজুরেরা মদ গিলে সব ভুলে ঘরে ঢোকে—তাই ঐ মদের দোকান। ক্ষেতের আশেপাশেই তাড়ির দোকান। যারা হাজার হাজার বছর ধরে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ধুকেধুকে জীবন চালায়, তারা যাতে নেশায় মশগুল হয়ে থাকে, তারা যাতে নিজেরা নিজেদের চিনতে না পারে, তারা যাতে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, তাই ঐ মদের দোকান। আর, এর সৃষ্টিকর্তা আমাদের সরকার, মালিক মহাজনরা। তাই এর বিরুদ্ধে আমরা যতোই বলি এর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন, যতদিন আমাদের মাথার ওপরে থাকবে ওরা, যতোদিন এই নিয়মের বেড়াজালে আমাদের হাত পা বাঁধা থাকবে। ততোদিন মদও থাকবে নেশাও থাকবে দোকানও থাকবে। চুলোয় যাক্ মদের দোকান! ও ভেবে আমরা কি—কি করতে পারি মশাই, ওরাতো সব কারবারী। ঐ মদ-ওয়ালা, চাল-ওয়ালা, চট-ওয়ালা, লোহাওয়ালা আর আমাদের সরকার সব এক সূত্রে বাঁধা, তাই একসুরে কথা বলে ওরা। যাক্, এই আবার

ব্যাপারীদের জাহাজের খবর না রাখাই ভালো। আমি মশাই একটু মিশুকে লোক, দেখেই বুঝেছেন। তাই সেদিন মশাই আমি আমার পুরোনো ক্লাবে গেছি। একদল ছেলে, তাদের নতুন একটা নাম নিয়েছে, "হিপি"। সেই হিপিদেরই একজন আমার এক কাঁধে হাত রেখে বলছে, এই নদেদা শোন মাইরী। মশাই বলব কি, ছেলেটা আমার থেকে বছর কুড়ি ছোট। তবে সাহস করে তো কিছু বলতে পারিনা, যদি ধোলাই খাই। তাই একটু মুচকি হেসে আলতো করে হাতটা নামিয়ে দিয়ে বললুম, বল ভাই বল। সে বললো আবার কাঁধে হাত তুলে দিয়ে, ওদিকে যে একটা খিচাইন হয়ে গেছে। আবার একটু (নিস্তব্ধ হাসি) মুচকি হেসে তার হাতটা আলতো করে নামিয়ে দিলুম, পাছে ব্যথা পায়। সে আবার—কাঁধে হাত তুলে দেয় আমি আবার নামিয়ে দিই। আরে ভাই, লোকে কি ভাববে? সে কাণ্ডজ্ঞান ওর না থাকলেও আমার তো আছে। অবশ্য ওদের কাণ্ডজ্ঞানের বালাই নেই! আর থাকারও তো কোন কারণ নেই; ওরা তো 'ছিপি' না—হিপি। ঐ আমেরিকা থেকে কি একটা আমদানী হয়েছে, তাতে গাঁজার থেকেও নাকি কড়া নেশা হয়; সেই খেয়ে ওরা স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। কাল্পনিক রাজ্যে একটু হাবুডুবু খায়। ওরা বলে আপনার যত দুঃখই থাক আপনি শুধু একবার এল-এস-ডি খান, তারপরেই দেখতে পাবেন আপনি দেশের মন্ত্রী হয়ে গেছেন কিংবা টাকার পাহাড়ে বসে আছেন নয়তো একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আপনার কোলে বসে আছে। তখন তাকে নিয়ে আদর করবেন, যেমনটি ইচ্ছে তাকে নিয়ে খেলা করবেন। একদা মশাই শুনেছিলাম, চীন দেশের মানুষকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোস্ত বন্ধুরা কোকেন খাইয়ে রেখে দিত। কিন্তু ঐ কোকেনের স্বপ্নও একদিন শেষ হলো। তারাও জাগলো। যেদিন তারা নিজের জীবন দিয়ে বুঝল ঐ কোকেন বিষ,

ওকে ছুঁড়ে ফেলে দাও! সবার আগে শেষ করে দাও ঐ কোকেন কারবারীদের। আমি শুধু ভাবি, সেদিন কি আমাদের জীবনে আসবে না? (এক ডোজ ওষুধ খেয়ে নেয়, একটু থেমে) ঐ…ঐ… কার যেন পায়ের শব্দ! আহা—নূপুর বেজে যায় রিণি রিণি, আমার মন কয় চিনি…চিনি! (একবার ডানধারের উইংসের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর খুব খুশী হয়ে) ওঃ! ছবি! এক্সেলেন্ট! কি সুন্দর সেজেছ তুমি? নীলাম্বরী শাড়ি, গোলাপী রং-এর হাতকাটা জামা! আঃ! অপূর্ব! অপূর্ব!! মানে আমার শালী এসেছে। দাঁড়ান ডাকছি। (একটু দূরে গিয়ে) কৈ এসো, প্রিয়ে, তোমায় দেখে যে আমার গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে—

আহা রে মরি
কি বাহার করি
গাগরি লয়ে কে চলে যমুনায়—
মোহন সুরে, কে ডাকিছে দূরে
চকিত নয়ন ফিরে ফিরে চায়
চলিতে চরণ বাধে চলা যায় না,
বলিতে শরম লাগে বলা যায় না।

কৈ, এসো তোমায় দেখবার জন্য যে আমার বন্ধুরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। ওঃ লজ্জা করছে! আসলে ওর লজ্জা করছে, তাইতো ও আপনাদের সামনে আসতে পারছে না। একটু অপেক্ষা করুন, আমি ডাকছি। ছবি, আমি যে অধীর আগ্রহে বসে আছি প্রিয়ে, কখন তুমি আসবে আমার কাছে? আজ আমার সেই গান গাইতে ইচ্ছা করছে,—

"আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।"

(থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে) কি? (একটু থেমে গম্ভীর হয়ে) ওঃ।

ও আসছে না আমার স্ত্রীর ভয়ে। এই সময়ে যদি সে দেখে ছবি আমার কাছে এসেছে, তাহলে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যাবে। (হঠাৎ খুনের প্রবৃত্তি জাগে) এই···এই···মুহূর্তে যদি আমি আমার খাণ্ডারী বৌটাকে হাতের কাছে পেতাম, তাহলে, তা···হ···লে (চোখ মুখ কপালে উঠে যায়) ঠিক এমনি করে ওর গলাটা টিপে আমি ছবির সামনে থেকে ঐ কাঁটাটা চিরকালের মতো সরিয়ে দিতাম। (হাঁপাতে থাকে)। তারপর থাকতাম আমি আর ছবি! আহাহা কতো মধুময় স্বপ্নের জীবন! (ক্ষিপ্ত হয়ে) ছি···ছি···ছি কতো পৈশাচিক বৃত্তিগুলো মনের কোণে চাপা থাকে! আমরা কত নোংরা না! সামান্ত একটু তৃপ্তির জন্য আমরা কত নীচে নামতে পারি!

নাঃ! বড্ডো বে-লাইন দিয়ে হাঁটছি! এ থেকেই প্রমাণ পায় আমরা খুব অস্থিরচিত্তের মানুষ। অবশ্য আমার চিত্তটা খুবই অস্থির তার কারণ বোধহয় উত্তর বাংলার বন্যা। তিস্তার বাণ আমায় পাগল করেছে। মাঝে মাঝে সেই দৃশ্য আমি যখন দেখতে পাই তখন পাগল হয়ে যাই। আমার অরুণ আমায় পাগল করেছে। সেই সঙ্গে পাগল করছে একটি নোংরা ক্লেদাক্ত ঘটনা। সেদিন রাত্রে যারা আমাদের উদ্ধার করেছিল, যাদের প্রচেষ্টায় সেদিন আবার আমরা আমাদের প্রিয়জনের সঙ্গে এক হলুম, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তারা? তারা কি সেদিন সত্যিই আমাদের কল্যাণের জন্য গিয়েছিল? ডাক্তার, মশাই সে নাকি সেবা করতে গেছে! অসুখ হয়েছে আমার পেটে, আর সে ডাক্তারবাবু ঘুরেফিরে তাকাচ্ছিলেন আমার বড়মেয়ের মুখের দিকে। এই সমাজসেবার নমুনা। আরো সমাজসেবী যারা গিয়েছিল, তাদেরও সোনাদানার দিকে তেমন ঝোঁক ছিল না।তার কারণ, বাহাত্তর ঘণ্টা সোনাদানার কোন দামই ওখানে ছিল না। তবে যে জিনিসের দাম ছিল তা তারা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিয়েছে।

আমরা ক্যাম্পে উঠলুম। তারপর দেখি আমার তেরো বছরের মেয়েটিকে একটি ছেলে কিছু রুটি দেখাতে দেখাতে নিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। ষোল বছরের মেয়েটিকে যখন আর একটি ছেলে নিয়ে যাচ্ছে তখন মনের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল! একবার ভাবলুম বাধা দিই। কিন্তু বেচারাতো ক্ষিদেতে ছটফট করছে। আ......আমি কি ওকে খাওয়াতে পারবো? তাই দমন করে নিলাম নিজের বুক-ফাটা উত্তেজনাকে। সত্যই ক্ষিধের জ্বালা বড় জ্বালা, না! তাই তো দেখলুম, আমার বিশ বছরের মালু, যার পুরুষের উপর ছিল এক-টা বীতশ্রদ্ধা, ঘেন্না, সেও সেই মুহূর্তে কয়েকটা রুটির লোভে কাতরভাবে এগিয়ে গেল একটা মুখোশধারী শয়তানের সাথে। আর ছাব্বিশ বছরের ডলি সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওদের ওই কয়েকটুকরো রুটির দিকে, আর বারে বারে তাকিয়ে ছিল আমার মুখের দিকে শুধু নীরব অনুমতির প্রার্থনায়। পেটে তার বড় ক্ষিদে মনে তার বড় যন্ত্রণা! পারলুম না—পারলুম না তাকে বাধা দিতে। কিন্তু একটা জায়গায় আমি খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, দাঁড়ালাম আমি বুক বেঁধে, যখন দেখলাম ঐ নরখাদকরা আমার স্ত্রীর দিকে রুটি নিয়ে হাত বাড়িয়েছে, আমি চিৎকার করে বললাম, নিও না......নিও না......নিও না ঐ রুটি, ছুঁড়ে ফেলে দাও ঐ নোংরা হাতের খাবার, যে খাবার আমাদের গোটা সংসারকে ধর্ষণ করে গেল, নিও না গো নিও না ঐ নোংরা খাবার।

কিছু খয়রাত যারাই দেয়, সে তার বিনিময়ে অনেক কিছু পাবার আশাতেই দেয়। নাঃ! যেমন ধরুন আমাদের কোন কোন বিদেশী শক্তি গায়ে পড়ে উপকার করবার জন্যে এগিয়ে আসছে, ভাবছেন তারা দিচ্ছে আর আমরা দিব্বি খাচ্ছি। ওরা সব দাতা কর্ণ। এরপর তারা বলবে—তোমরা ঠিক ভাবে দেশ চালাতে পারছোনা,

আমাদের সৈন্য মোতায়েন থাকা দরকার। তারপরেই দেখবেন আপনার আমার ঘরে বেশ কিছু সাহেব বাচ্চার আমদানী হয়েছে। (একটু ওষুধ খেয়ে নিল) জীবনটাকে যত সহজ ভাবে চালিয়ে নেওয়া যায় তত ভাল লাগে, না! আমিও ছোটবেলায় ঐ রকম স্বপ্নই দেখতাম। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে, আমার এক একটা স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেমন করে আমার বড় মেয়ের যৌবনের পাপড়িগুলো একটা একটা করে খসে যাচ্ছে। পাঁচ বছর আগে যাকে কত সুন্দর লাগত, আজ তাকে দেখবেন, চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে, সমস্ত চেহারাটায় একটা বার্ধ-ক্যের ছাপ পড়ে গেছে। আমি যখনই রাত্রে বাড়ি ফিরি, সে দাঁড়িয়ে থাকে আমার অপেক্ষায়। হয়ত শুনতে চায় নতুন কোন পাত্রের সংবাদ। কিংবা......কিংবা, না থাক, অত নোংরা কথা নাই বা উচ্চারণ করলাম। ওকে আমি বড় ভালবাসি। তাই বাড়ি গিয়ে যাতে ওর মুখ দেখতে না হয়, তাই অনেক রাতে বাড়ি ফিরি। নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ি। সূর্যোদয়ের আগে পালিয়ে আসি পাছে ওদের করুণ মুখের দিকে তাকাতে হয়। পাছে ওদের চাহি-দার কথা শুনতে হয়। এই একাকীত্বের অন্ধকারে থেকে থেকে এক একবার মনে হয়, আচ্ছা, আমি কি বাপ হয়ে সন্তানের প্রতি কোন দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি? স্বামী হয়ে কি স্ত্রীর প্রতি কোন দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি? আমি তো এক জন রক্ত-মাংসের মানুষ, আমি কি এই সমাজের জন্য কিছু করতে পেরেছি? না......না......না ঐ একটি কথা আমার সামনে বিদ্রূপের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। না...না...না...তাই আজ আমি ঠিক করেছি একটা চরম কিছু করব বলে। আমি এতক্ষণ ওষুধের নাম করে যেটা খেয়েছি, সেটা ছিল ওষুধের শিশিতে মদ। আর এখন এই মদের

নেশায় মত্ত হয়ে যেটা পান করব তা'হল বিষ। হ্যাঁ বিষ! ভাবছেন আপনাদের বিপদে ফেলবো? না......না, আমি আমার স্বীকারোক্তি একটা চিঠিতে লিখে রেখেছি। অবশ্য এটা একটা সামান্য দালালের চিঠি। এর মধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই সাহিত্য খুঁজবেন না। (চিঠি বার করে পড়তে থাকে)—"আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী তারা, যারা আমাদের তিলে তিলে শেষ করে ফেলছে, যারা আমাদের রক্ত শুষে খাচ্ছে, যারা আমাদের শ্রম চুরি করে নিজেরা কোটিপতি হয়ে আমাদেরই ওপর খবরদারি করছে, ঐ ধনিক শ্রেণী আর তার তাবেদার এই সরকার। যারা আমাদের করেছে নিঃস্ব, যারা আমাদের দেশটা বিদেশীর কবলে বিকিয়ে দিচ্ছে, সেই ভণ্ড তপস্বীরা আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী। তাদের কোনদিন ক্ষমা করতে পারিনি, পারবও না। (হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে) ঐ···ঐ কে যেন আমায় ডাকছে, কে যেন এসেছে। বোধহয়...হ্যাঁ অরুণ এসেছে। হ্যাঁ···হ্যাঁ আমার মন বলছে, আমি যখন অন্ধকারের মধ্যে পথ খুঁজি ওরাই তো আলোর নিশানা দেয়। হ্যাঁ...হ্যাঁ, ঐ...ঐ...ঐতো অরুণ এই দিকেই আসার চেষ্টা করেছে, কারা যেন বাধা দিচ্ছে, বোধহয় পুলিশ। দাঁড়ান, দেখি কেন অরুণ আসতে পারছে না। (এগিয়ে গিয়ে) ঐ···ঐ···ঐতো অরুণ বলছে···হ্যাঁ···হ্যাঁ বক্তৃতা দিচ্ছে। তাই ওখানে দাঁড়িয়েই গলা ফাটিয়ে বলছে—বাবা তিস্তার জল আমায় শেষ করতে পারেনি; আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছে এই জল্লাদ সরকার...। দেখুন দেখি, ও আসতে চাইছে অথচ ওকে আসতে দিচ্ছে না কেন? এ কিসের গণতন্ত্র? আচ্ছা...আমি কি ওকে দৌড়ে গিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে আসবো? কিন্তু আমার কতটুকুই বা শক্তি! (উত্তেজিত হয়ে) কেন পারব না? কেন পারব না আমি? আমি তো একা নই, আমিতো শুধু আমি নই, আমার মধ্যে লুকিয়ে

আছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রক্তমাংসের মানুষ, যারা ভাঙতে জানে, যারা পৃথিবীকে ওলটপালট করে দিতে জানে। আমি চেষ্টা করলে যে কোন আটক থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারব। ঐ... ঐতো বলছে, বাবা, আমি একা নই। আমি শহরের যৌবনের দৃত ছাত্র, আমি কারখানার সংগ্রামী মজুর আবার আমিই ক্ষেতের সংগ্রামী কৃষক। যারা লড়তে জানে, লড়ে মরতে জানে, যারা এই ঘুনে ধরা সমাজটাকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আমি সেই আগুন জ্বালছি, জ্বালবো। ঐ...ঐতো গলা ফাটিয়ে বলছে,—

আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
যবে অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।

(বলতে বলতে খুব বিচলিত হয়ে পড়ে, অস্থিরতায় ছটফট করে) তাইতো কি করি, কি যে করি এখন ? (হাতে বিষের শিশিতে চোখ পড়ে যায়) না...না...বিষ! বিষ খেয়ে মরার তো সময় নেই ? তার চেয়ে যদি ওদের কোন কাজে লাগি, যারা সম্মুখ পথের আলো দেখাচ্ছে, আশার হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওদের যদি ঐ গারদ ভেঙে ছিনিয়ে নিয়ে আনতে পারি, একবার শেষ চেষ্টা করি। এখন আগুনের বেলা, আরতো বক্তৃতার সময় নেই। কিছু মনে করবেন না। পারেন তো আপনারাও এগিয়ে আসুন। কাপুরুষের মতো বিষ খেয়ে মরবো না। জ্বলন্ত আগুনের মতো জ্বলে উঠবো, যে আগুন ছড়িয়ে পড়বে শহরে, গ্রামে, গ্রামান্তরে, দেশে দেশান্তরে। আমি যেন হতে পারি সেই আগুনেরই ফুলকি।

[বিষের শিশিটা টেবিলে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল। আস্তে আস্তে পর্দা পড়ে গেল]

———

নানা রংয়ের দিন

মূল
চেখভ

রূপান্তর
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র

রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
বৃদ্ধ অভিনেতা, বয়স ৬৮
কালীনাথ সেন ॥ প্রম্পটার, বৃদ্ধ।

[পেশাদারী থিয়েটার, একটা ফাঁকা মঞ্চ। পেছনে রয়েছে রাত্রে অভিনীত নাটকের অবশিষ্ট দৃশ্যপট, জিনিষপত্র আর যন্ত্রপাতি। মঞ্চের মাঝখানে একটি টুল ওল্টানো রয়েছে। এখন রাত্রি। চারিদিকে অন্ধকার। দিলদারের পোষাক পরে প্রবেশ করেন রজনীকান্ত চৌধুরী, তাঁর হাতে একটা জলন্ত মোমবাতি, হাসছেন তিনি।]

রজনী ॥ আচ্ছা, ব্যাপারটা কী হলো বলতো? কী গেরো, ঘুমুলুমতো ঘুমুলুম একেবারে গ্রীণরুমে? নাটক কখন শেষ হয়ে গেছে, হল ফাঁকা। সাজাহান জাহানারা সব পাত্রপাত্রী ভোঁ-ভোঁ—আর আমি দিলদার—এতক্ষণ পড়ে পড়ে গ্রীণরুমে নাক ডাকছিলুম! ধ্যের! বারোটা বেজে গেছে আমার—বারোটা বেজে পাঁচ! রাত কত হলো কে জানে? এত টানলে কী আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে? চেয়ারে পড়েছি আর ঘুম। বাঃ! বাঃ বুড্ডা আচ্ছাই কিয়া। ক্যেয়া হোগা তুমসে? কুছ নেহি! বিলকুল কুছ নেহি! (চেঁচিয়ে) রামব্রীজ!

এ রামব্রীজ। আরে, গেল কোথায় লোকটা! কোথায় ধেনো টেনে পড়ে আছে ব্যাটা! এ রামব্রীজ!

[হতাশ হয়ে পড়েন। টুলটা সোজা করে তার ওপর বসেন। মোমটাকে মাটিতে রাখেন]

চারদিক নিঃঝুম! খালি আমার গলাটাই ঘুরে ফিরে কানে বাজছে আমার। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। নির্ঘাৎ যেন গেটে তালা পড়ে গেছে! আচ্ছা, মাতালের পাল্লায় পড়াগেছে যা হোক! (মাথা ঝাঁকিয়ে) উফ! আজ রাতে কৎটা গিলেছি? মাতালের এই হচ্ছে বিপদ। ছাড়ব বললে ছাড়ান নেই!

কাল রাতেও ঠিক এই ব্যাপার! মদ গিলে গ্রীণরুমে পড়েছিলুম। রামব্রীজই ঘুম থেকে তুলে ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছিলো। তার দরুণ আজ সন্ধ্যেবেলা নগদ তিন টাকা বখশিশও দিলাম ওকে। তার ফল হলো কী না সেই টাকায় তিনি নিজেই আজকে মদ গিলে কোথায় পড়ে আছেন!

আরে বাবা, দিলুম তোকে বখশিশ দিলুম! উনি আবার সেই আনন্দে আমাকেই দেড় বোতল খাইয়ে গেলেন।…এঃ, একেবারে রামধেনো। উফ্! বুকের ভেতরটা থর্ থর্ থর্ থর্ করে কাঁপছে যে! মুখের ভেতরটা যেন auditorium! Interval-এ সব দর্শকরা হাঁটাহাঁটি লাগিয়ে দিয়েছে! উঃ জিভটা টানছে না কীরে বাবা! (একটু থামেন) অকারণ! অকারণ রে বাবা, কেউ যদি বলে রজনীবাবু অনেক তো বয়স হলো এবার মদ খাওয়াটা ছাড়ুন! কোনো জবাব আছে? উঁহুঁ। উঃ ভগবান! শির দাঁড়াটা গেল! বুকটা কী ভীষণ কাঁপছে। মনে হচ্ছে…মনে হচ্ছে যেন…ওঃ কী ভীষণ কাঁপছে! …রজনীবাবু ভাই, শরীরটার দিকে একটু নজর দিন। আর কী এ বয়েসে এতো সয়? কতো বুড়ো হয়েছেন ভাবুন দিকিনি! হাঃ হাঃ

হাঃ—হ্যাঁ লাগে! (থামেন) হ্যাঁ! বুড়ো হয়েছেন বৈকী রজনীবাবু। ৬৮ বছরটা কী নেহাৎ কম বয়েস?—এঁ্যা। ছোকরাদের মতো ঢং-ঢং করতে পারেন, লম্বা-চওড়া চেহারাটা আছে আরো চালিয়ে দেবেন কিছুদিন! আর আপনি লম্বা লম্বা চুলে Daily হাফ্‌শিশি কলপ লাগিয়ে যে রকম ইয়ার্কী—টিয়ার্কী মারেন, তাতে বয়েসটা ঠিক বোঝায় না।···কিন্তু যা গেল, সেকী আর ফিরবে? ৬৮টা বছর—একপা একপা করে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে—আর জীবনে ভোর নেই সকাল নেই দুপুর নেই—সন্ধ্যেও ফুরিয়েছে—এখন শুধু মাঝরাত্তিরের অপেক্ষা—এখানেই গল্প শেষ! এরপর রজনীবাবু বলবেন আমি Last Scene-এ play করবো না। কিন্তু Curtain উঠবেই। শ্মশানঘাট—পরিচিত বন্ধু বান্ধব ওপারের দূত উইংসে রেডী—(একটু থামেন। সামনের দিকে তাকান হলের শেষ প্রান্তে) জানেন, রজনীবাবু। এই ৪৫ বছর থিয়েটারের জীবনে এই প্রথম আমি মাঝরাতে একা একেবারে একা ষ্টেজে বসে আছি—জীবনে প্রথম—কেন জানেন? এসবই হচ্ছে মাতালের কারবার (ফুটলাইটের কাছে যায়) সামনেটা কিছু দেখা যায় না! ওই দূরে—ঐ তো ব্যালকনি না! First box দেখতে পাচ্ছি এখন—ঐ তো Second, third, forth Box টাও—সব গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে। সব মিলিয়ে যেন একটা শ্মশান—যেন ওর দেয়ালে কালো কালো অক্ষরে লেখা আছে জীবনের শেষ কথাগুলো—কতো নড়াচড়া, কতো উদ্বেগ, কতো প্রেম, কতো মায়া—সব মিলিয়ে যেন মৃত্যুর নিঃঝুম ঘুমের আয়োজন করে রেখেছে কারা—উঃ, কী শীত—সব আছে শুধু মানুষ নেই—সব ভুতুড়ে বাড়ীর মতো খাঁ খাঁ করছে—সব মরে গেছে নাকি! শির দাঁড়ার ভেতর দিয়ে কী রকম শিরশির্ করছে যেন! (হঠাৎ চেঁচিয়ে) রামব্রীজ! রামব্রীজ কাঁহা গ্যয়ারে!···উঃ এই মাঝরাতে

একা একা কী সব, মৃত্যু—শ্মশান—সব আবোল তাবোল ভাবছি! হবে না কেন? কম গিলেছি আজকে! মদটা ছেড়ে দিন রজনীবাবু, মদটা ছেড়ে দিন! বুড়ো হয়ে গেছেন! আর দু'দিন বাদেই খাটে উঠবেন মশাই! ধরুন আপনার মতো বয়েস হয়েছে যাদের—৬৮ বছর—তাঁরা সময় মতো মাপজোখ করে খাওয়া দাওয়া করেন—সকাল সন্ধ্যে পার্কে বেড়াতে যান—সন্ধ্যেবেলা কেত্তন-টেত্তন শোনেন—ভগবানের নাম করেন—আর আপনি, রজনীবাবু। এসব কী করছেন মশাই? মাঝরাত্তে দিলদারের পোষাক পরে পেট ভর্ত্তি মদ গিলে কী সব আবোল তাবোল বকছেন বলুন তো? কেউ শুনলে ভয় পেয়ে যাবে যে! আন্দাজ করুন দিকি, আপনার চোখগুলো এখন কেমন দেখতে লাগছে? যান যান! make-up টেক-আপ তুলে চুল-টুল আঁচড়ে, ভদ্র গোছের জামা কাপড় পরে বাড়ী যান দিকিন। কী যে পাগলামি করেন! সারারাত ধরে এই সব ভাবলে হঠাৎ হার্টফেল করবে যে।

[বেরিয়ে যেতে চান উইংস দিয়ে। যেই এগিয়েছেন অমনি দেখা গেল, পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে—গায়ে কালো চাদর, এলোমেলো চুল বুড়ো কালীনাথ সেন ঢোকেন। রজনীবাবু ভয়ে চীৎকার করে পিছিয়ে যান!]

কে? কী চাই তোমার! কী চাই?

[অর্দ্ধেক রাগ, অর্দ্ধেক মিনতি করে]

কে তুমি?

কালী॥ আমি!

রজনী॥ (এখনও ভয় পেয়ে) কে, নাম বলো!

কালী॥ (আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে) আমি চাটুজ্জে মশাই—কালীনাথ—আপনাদের প্রম্পটার কালীনাথ—

রজনী ॥ (অসহায় হয়ে টুলের ওপর বসে পড়েন, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে থাকে, সারাশরীর কাঁপতে থাকে) অ্যাঁ, কে? ওহ্, তুমি, তুমি, কালীনাথ? তুমি এতরাত্রে কী করছিলে এখানে?

কালী ॥ আমি রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রীণরুমে ঘুমুই চাটুজ্যে মশাই; কেউ জানে না। আপনি বামুন মানুষ, মিছে কথা বলবো না—আপনার পায়ে ধরছি এ কথাটা মালিকের কানে তুলবেন না চাটুজ্যেমশাই—আমার শোবার কোন জায়গা নেই—একেবারে বেঘোরে মারা পড়বো তাহলে—

রজনী ॥ ওহ্, তুমি কালীনাথ। (আস্তে)···তাই বলো! (আস্তে) তাই বলো কালীনাথ (আস্তে)—তুমি! (আস্তে)···কী হয়েছে জানো···আজকের showতে আমি ৭টা clap পেয়েছি···দু'বার তো পষ্ট শুনেছি, "মাইরি! এই নইলে acting!" কে যেন একবার বললে, "দেখেছো রজনী চাটুজ্যে ইজ্ রজনী চাটুজ্যে—মরা হাতী সোয়ালক্ষ!" তাহ'লেই বুঝলে কালীনাথ, পাবলিক এখনও কীরকম ভালবাসে আমাকে? আসলে যতক্ষণ ষ্টেজে দাঁড়িয়ে থাকি, ততক্ষণই কদর। তারপর যে যার ঘরে যায়, তখন কে কার! কেই-বা বুড়ো মাতালটার খোঁজ করে বলে, "উঠুন রজনীবাবু, চলুন বাড়ী যাবেন?" কেউ বলে? বলে না।

কালী ॥ বাড়ী যাবেন না আপনি—চাটুজ্যেমশাই?

রজনী ॥ কেন? বাড়ী ফিরবো কেন? বাড়ী কোথায়?

কালী ॥ আপনার মনে পড়ছে না, আপনার বাড়ী কোথায়?

রজনী ॥ তা' পড়ছে বইকি। কিন্তু কী হবে বাড়ী ফিরে? একটুও ভালো লাগে না বাড়ীতে। জানো, কালীনাথ, পৃথিবীতে আমি একা। আমার আপন জন কেউ নেই, বৌ নেই, ছেলেমেয়ে নেই, সঙ্গী-সাথী নেই; কেউ কোথাও নেই! আমি একদম একা। একেবারে

নিঃসঙ্গ—কেমন জানো—ধূ ধূ করা দুপুরের জলন্ত মাঠে বাতাস যেমন একা—যেমন সঙ্গীহীন—তেমনি—আদর করে একটা কথা বলে এমন একটা লোক আছে আমার? মরবার সময় মুখে দুফোঁটা জল দেয় এমন কেউ নেই আমার। আর জানো, যখনই এসব কথা ভাবি তখন ভয়ে যেন বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে আমার। তখন কেউ দুটো ভালো কথা বলে? কেউ কী এই বুড়ো মাতালটার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়? দেয় না। আমি কার? কে চায় আমাকে? আমার দিকে অল্প একটু নজর দেয় এমন সময় আছে কারো? কারো না, জানো কালীনাথ, কারো না।

কালী॥ (জলভরা চোখে) পাবলিক তো আপনাকে ভালবাসে চাটুজ্যে মশাই?

রজনী॥ পাবলিক? এই মাঝরাতে পাবলিক এখন থিয়েটার দেখে-টেখে গিয়ে টেনে ঘুম লাগাচ্ছে। তুমি কী ভাবছো পাবলিক আমাকে এমনই ভালবাসে যে ঘুমের ঘোরে আমাকেই স্বপ্ন দেখছে! পাগল! আমাকে আর কেউ চায় না। আমার ঘর-সংসার, বৌ-ছেলেমেয়ে কেউ নেই, কিচ্ছু নেই।

কালীনাথ॥ কিন্তু তাই নিয়ে আপনার মতো লোকের এত দুঃখ চাটুজ্যে মশাই—!

রজনী॥ আমি যে মানুষ কালীনাথ। হাত-পা ওয়ালা একটা জ্যান্ত মানুষ। আমার শিরায় শিরায় কী জল বইছে? রক্ত বইছে না? সদ্বংশের পবিত্র রক্ত। বিশ্বাস কর কালীনাথ আমি একটা উঁচু বংশে রাঢ়ের সবচেয়ে প্রাচীন ভদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলুম—এই লাইনে আসার আগে আমি পুলিসে চাকরীতে ঢুকেছিলুম—ইন্সপেক্টর অফ্ পুলিস—আর তখন কী চেহারাই না ছিল আমার! তখন ছোকরা বয়স তো? চেহারায় জেল্লা ছিল, কারো তোয়াক্কা করতুম না, মনে সাহস ছিল।

শরীরে শক্তি ছিল। আজকের চার ডবল কাজ করতে পারতুম একাই। তারপর একদিন, বুঝলে চাকরী ছেড়ে দিলুম। আর একরকম করে জীবন সুরু করা গেল, নাটক নিয়ে। সেসব দিনের কথা কি তোমার মনে আছে কালীনাথ? তখন কী নামডাকই ছিল আমার! কী খাতির! কী প্রতিপত্তি! সে সব দিনও যেন কবে কেমন করে ফুরিয়ে গেল—শেষ হয়ে গেল জীবনের সব ভাল ভাল বছরগুলো—আহাহা, কালীনাথ সব গেল একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে গেল আমাকে (দাঁড়িয়ে, কালীনাথের গায়ে ঠেস দিয়ে) জানো, এই একটু আগে সামনের ওই অন্ধকারের দিকে চেয়েছিলাম—হঠাৎ আমার মনে হল কে যেন আমার সমস্ত জীবনটাকে আমার চোখের সামনে মেলে ধরেছে—থিয়েটারের দেওয়ালে অন্ধারের গভীর কালো অক্ষরে লেখা আমার জীবনের ৪৫টী বছর কালীনাথ—কী জীবন! ঐ অন্ধকারে আশ্চর্য স্পষ্ট সে সব অক্ষর—আমি দেখলাম কালীনাথ—যেমন স্পষ্ট তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি এখন, ঠিক তেমনিই—তেমনি স্পষ্ট একে একে পার হয়ে যেতে দেখলাম আমার যৌবন, শক্তি, সম্ভ্রম, প্রেম, নারী! হ্যাঁ! একটা মেয়ে! জানো কালীনাথ, একটা মেয়ে!

কালী ॥ ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোবেন, চাটুজ্যেমশায়?

রজনী ॥ তখন আমার বয়েস বেশী নয়, সবে এলাইনে এসেছি। সারা দেহে মনে ফুটছে টগ্‌বগ্‌ করে উৎসাহ—তখন একটা মেয়ে একদিন আমার থিয়েটার দেখে প্রেমে পড়ল আমার। বিশ্বাস কর, সে খুব বড়লোকের মেয়ে—বেশ লম্বা, ফর্সা সুন্দর ছিপছিপে গড়ন তার, বয়েস কম, মনটা খুব ভাল—সব ভাল তার—কিন্তু ওরই মধ্যে কোথায় যেন আগুন ছিল। গ্রীষ্মের বিকেলে সূর্যাস্তে যে আগুন লুকিয়ে থাকে সেই আগুন! কালীনাথ, সে কী আশ্চর্য মেয়ে কেমন করে বোঝাবো তোমাকে।

এমন গভীর ওর টানটান কালো চোখ যে অন্ধকার রাতে একাএকা ভাবলে মনে হতো সে যেন দিনের আলো। কী অদ্ভুত হাসি তার, ঢেউখেলানো রাশি রাশি কালো চুল। দাঁড়াও, ওর চুলগুলোর কথা বুঝিয়ে বলি! সমুদ্রের ঢেউ দেখেছো তো? মনে হয় না ঢেউ ঢেউ-এ ঢেউ ঢেউ-এ কী আশ্চর্য শক্তি! কিন্তু জানো, যদি তোমার বয়েস কম হতো, যদি সেই দৃষ্টি থাকতো তোমার—যদি দেখতে ওর রাশি রাশি কালো চুলের ঢেউ—তাহলে তোমার ধারণা হতো—কেমন করে দুর্গম পাড়কে ধ্বসিয়ে দেয় পাহাড়ী নদীর দুর্গম খরস্রোত। কোন অমোঘ শক্তির গতিতে সমস্ত পাহাড় থরথর করে কেঁপে উঠে তীব্র আক্ষেপে। ভেঙে চুরমার হয়ে যায়—মুহূর্তে প্রলয় ঘটে যায় পৃথিবীতে! তখন কী মনে হতো না তোমার—এ ঢেউ যদি আমাকে নিয়ে যায় তো যাক—আমাকে উল্টেপাল্টে দিয়ে জীবনের খেলা খেলতে চায় তো খেলুক। সত্যি জানো, আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমি ওর সামনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছি—ঠিক যেমন এখন তুমি দাঁড়িয়ে আছো আমার সামনে! আর একদিন—সেদিন তাকে দেখে মনে হয়েছিল ভোরের প্রথম আলোর চেয়েও সুন্দর। সেই সেদিন তার আমার দিকে সেই একরকম অদ্ভুত করে চেয়ে থাকা, মরে যাবো—তবু ভুলবো না—। সেই তার আশ্চর্য ভালোবাসা—ও শুধু আমাকে আলমগীরের পার্ট করতে দেখেছিল—আর কিছু না। আমার নিজের থেকে তাকে কোন কথা বলতে হয়নি। রেখে-ঢেকে সত্যি মিথ্যে কোন কথা না। ও নিজে যেচে আলাপ করলো আমার সংগে। দিন যায়! ক্রমশঃ ঘনিষ্ট হলাম আমরা। তখনকার দিনে আমার acting মানে সে তো একটা ব্যাপার। বয়েস কম—সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যত মনে কতো আশা-আনন্দ-নির্ভরতা। একদিন ওকে বললাম, "এতোদিনে তো আমরা দুজনে দুজনকে

বুঝেছি। একবার নতুন করে চেনা হোক। চলো আমরা বিয়ে করি। (ওর গলার স্বর ডুবে যায়) ও কী বললো জানো…বললো, "আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে চাই। চলো, বিয়ে করি আমরা. কিন্তু তার আগে তুমি থিয়েটার করা ছেড়ে দাও।" থিয়েটার! করা ছেড়ে দেব! কেন জানো? ও যে ভদ্রবংশের বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে। থিয়েটারের লোকের সংগে ও জীবনভোর প্রেম করতে পারে। কিন্তু বিয়ে? নৈব নৈব চ! আমার মনে আছে সে রাত্তিরে কী যেন পার্ট করছিলুম ভালো—কী যেন—কী একটা—বাজে হাসির বই। ষ্টেজে দাঁড়িয়ে পার্ট করতে করতে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেল—সেইরাত্রে জীবনে মোক্ষম বুঝলাম যে যারা বলে অভিনয় একটা পবিত্র শিল্প তারা সব গাধা গাধা। দেখলাম ওসব বড় বড় কথাগুলো সব মিথ্যে কথা, বাজে কথা—অভিনয় মানে একটা চাকর, একটা জোকার। লোকেরা সারাদিন খেটে-খুটে এলে ক্লান্ত তাদের আনন্দ দেওয়াই হোল নাটকওয়ালাদের একমাত্র কর্তব্য। মানে এককথায়—একটা ভাঁড়ের যা কাজ তাই। সেদিনই বুঝলুম—'পাবলিক' এর চরিত্র কী—আর তারপর থেকে, ও সব ফাঁকা হাততালিতে, খবর কাগজের প্রশংসায়, মেডেল সার্টিফিকেটে—থিয়েটারকে আমি বিশ্বাস করি না। তারা আলবৎ হাততালি দেবে—খুব প্রশংসা করবে—সব ঠিক—তারপরে যেই ষ্টেজ থেকে নামলে—অমনি তুমি তাদের কেউ না, তুমি একটা নকলনবীশ তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি নিতান্তই কম, তোমার শিক্ষাদীক্ষা চলনসই তুমি একটা অস্পৃশ্য ভাঁড়—একটা বেশ্যা। তাদের নিজেদের অহংকারকে খুশী করার জন্যে তারা তোমার সংগে আলাপ করবে—চা সিগারেট—খাওয়াবে কিন্তু থিয়েটারের পরিচয়ে কেউ তার বোন কিংবা মেয়ের সংগে বিয়ে দেবে

কারো?—কক্ষণো না! জানো আমি ওদের কাউকে বিশ্বাস করি না (টুলে বসে পড়ে) কাউকে না!

কালীনাথ॥ পুরোনো দিনের কথা ভুলে যান চাটুজ্যে মশাই। শুধু শুধু মন খারাপ করে কী হবে! চলুন, বাড়ী নিয়ে যাই আপনাকে—

রজনী॥ থিয়েটারের মতো একটা জঘন্য বৃত্তির পুরো কংকালটা আমি দেখতে পেলুম সেদিন...হঠাৎই দেখতে পেলুম—তারপর থেকে—তারপর থেকে সেই মেয়েটা—কী হোলো কে জানে। আমারও আর কিছু ভালো লাগতো না—ভবিষ্যতের চিন্তা টিন্তা সব মাথায় উঠে গেল। যা-তা বইয়ে পার্ট করতে লাগলাম,—যতো সব ক্লাউন, জোকারের পার্ট। যতোসব ভাঁড়ের পার্ট। লোকের কাছে শুনলুম এই সব দেখে-টেখেই নাকি দেশের ছোঁড়াগুলো গোল্লায় যাচ্ছে। যেই ষ্টেজে নেমেছি, লোকে বলেছে, বাঃ বাঃ দারুণ! কী ট্যালেন্ট! ধুত্তোর, নিকুচি করেছে ট্যালেন্টের। আস্তে আস্তে বয়েস বাড়ল, গলার স্বর নষ্ট হয়ে গেল চেহারার চটক মরে গেল, একটা নতুন চরিত্রকে বোঝাবার ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল…থিয়েটারের দেওয়ালে কার অদৃশ্য হাত কালো কালো জলন্ত অক্ষরে লিখে দিয়ে গেল প্রাক্তন অভিনেতা রজনী চাটুজ্যের প্রতিভার অপমৃত্যুর করুণ সংবাদ! আমি আগে বুঝতে পারিনি; আজ রাতে মদে ঘুমে থেকে চমকে জেগে উঠে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কথাটা। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে জীবনের ৬৮টা বছর। আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বুড়ো রজনী চাটুজ্যে। আর ক' পা এগোলেই শ্মশানের চিতার আঁচ লাগবে গায়ে, ঝলসে দেবে আমাকে।

কালীনাথ॥ না না। আপনি চুপ করে বসুন এখানে। আর কিছু

ভাববেন না। ভগবান আছেন চাটুজ্যেমশাই। অদৃষ্ট তো মানেন আপনি! (চেঁচিয়ে) রামব্রীজ! রামব্রীজ!

রজনী॥ (হঠাৎ জেগে) সে সব দিনে কী না পারতুম। যেমন খুশী গলা খেলাতে পারতুম, শরীরটাকে নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারতুম। তোমার মনে আছে সে সব দিনের কথা—কী সহজে এক একটা চরিত্র বুঝতে পারতাম—কী রকম আশ্চর্য সব নতুন রংয়ে চরিত্রগুলো চেহারা পেত—কি অসীম বিশ্বাসে ভরা ছিলো এ জায়গাটা (বুকে ঘা মেরে) শোন হে, শোন তো, বলি! দাঁড়াও একটু দম টেনে নিই আগে! মনে আছে রিজিয়া নাটকে বক্তিয়ারের ঐ Sceneটা—

"...শাহাজাদি! সম্রাট নন্দিনি!
মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে? জান না কি
তাতার বালক মাতৃঅঙ্ক হতে ছুটে
যায় সিংহ শিশু সনে করিবারে মল্ল
রণ? শাণিত ছুরিকা ক্ষুদ্র ক্রীড়নক
তার! জীবনের ভয় দেখাও, সম্রাজ্ঞি!
বক্তিয়ার মরিতে প্রস্তুত সদা—"

খুব খারাপ হচ্ছে না, কী বল? আচ্ছা ঐ সীনটা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার! সেই D. L. Royর সাজাহান নাটকের ঔরংজীব আর মহম্মদের Sceneটা—প্রথমে ঔরংজীব একা—

"এ বড় ভয়ংকর যোগ। সাহানাবাদ আর যশোবন্ত সিংহ। আমি কিন্তু প্রধান আশংকা কর্চ্ছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা (ঘাড় নাড়লেন) কম কথা নয়। আমার প্রতি একটা অবিশ্বাসের বীজ তার কে বপন করে দিয়েছে। জাহানারা কি?—এই যে মহম্মদ!

(অধৈর্য হয়ে) আঃ ! Come on, quick। মহম্মদের Catchটা দাও তো। মহম্মদের Catchটা—।

কালীনাথ ॥ পিতা আমাকে ডেকেছিলেন ?

রজনী ॥ হাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি, তুমি সুজার অনুসরণ করবে। মীরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম। তোমর তো ভালোই মনে আছে হে। এ-ও প্রতিভা। এ্যাঁ! আর কিছু মনে করিয়ে দাও তো। পুরোনো দিনের যে কোন নাটকের যে কোন জায়গা—

ম ॥ যে আজ্ঞা পিতা।

ঔ ॥ আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রৈলে যে ? সে বিষয়ে কিছু বলবার আছে ?

ম ॥ না পিতা, আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।

ঔ ॥ তবে ?

ম ॥ আমার একটা আর্জ্জি আছে পিতা।

ঔ ॥ কী !—চুপ করে রইলে যে। বল পুত্র।

ম ॥ কথাটা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব মনে কর্চ্ছি ; কিন্তু এ সংশয় আর বক্ষে চেপে রাখতে পারি না। ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন।

ঔ ॥ বল।

ম ॥ পিতা ! সম্রাট সাজাহান কি বন্দী ?

ঔ ॥ না ! কে বলেছে ?

ম ॥ তবে তাঁকে প্রাসাদে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে কেন ?

ঔ ॥ সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।

ম ॥ আর ছোট কাকা—

ঔ ॥ মোরাদ ?

ম ॥ —তাঁকে এরূপে বন্দী করে রাখা কি প্রয়োজন ?

ঔ ॥ হাঁ।

ম ॥ আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্তমানে।

ঔ ॥ হাঁ পুত্র।

ম ॥ পিতা। (বলিয়াই মুখ নত করিলেন।)

ঔ ॥ পুত্র! রাজনীতি বড় কূট। এ বয়সে তা বুঝতে পার্ব্বে না। সে চেষ্টা করোনা।

ম ॥ পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দী করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, পিতামহ বর্তমানে এ সিংহাসনে বসা, এর নাম যদি রাজনীতি হয় সে রাজনীতি আমার জন্য নয়···

ঔ ॥ পুত্র······পার্টটি বেড়ে মুখস্থ করেছতো!

ধরো—ধরো—[আনন্দিত হাসিতে ফেটে পড়ে 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজীবের সেই ভয়ংকর sceneটা—যখন সবাইকে খুন করে ঔরংজীব সিংহাসন পেয়েছেন—তখন একদিন মাঝ রাতে ঔরংজীব একেবারে একা—ভাবছেন—]

"যা করেছি—ধর্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হতো। (বাহিরের দিকে চাহিয়া) উঃ কি অন্ধকার! কে দায়ী? আমি! এ বিচার, ও কি শব্দ?—না বাতাসের শব্দ!—একি! কোন মতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর করতে পারছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি। কিন্তু নিদ্রা আসে না, (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) উঃ কি স্তব্ধ! এত স্তব্ধ কেন! (পরিক্রমন পরে সহসা দাঁড়াইয়া) ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির। —সুজার রক্তাক্ত দেহ! —মোরাদের কবন্ধ। যাও সব। আমি বিশ্বাস করিনা। ঐ তারা আবার। আমায় ঘিরে নাচছে! —কে তোমরা? জ্যোতির্ম্ময়ী ধূমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও। চলে যাও—ঐ মোরাদের কবন্ধ! আমায় ডাকছে; দারারও মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাসছে—এ কি সব—ওঃ। (চক্ষু ঢাকিলেন; হাততালি

দিয়ে জোরে হেসে ওঠেন) সাব্বাশ! সাব্বাশ! এখন বয়েসগুলো কোন চুলোয় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হে! কোথায় গেল ৬৮টা বছরের শোক—কোথায় শ্মশানের চিতার আঁচটা। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি কালীনাথ, প্রতিভা আমার মরেনি, শিরায় শিরায় রক্তের সংগে বয়ে চলেছে—এর নামই যদি যৌবন না হয়, শক্তি না হয়, তা হ'লে জীবন বস্তুটা কী বল তো! প্রতিভা যার আছে তার বয়সে কী আসে যায়। এইতো জীবনের সত্য, কালীনাথ। আমার অ্যাক্টিং তোমার ভালো লেগেছে, না? সত্যি···ভালো লেগেছে! লেগেছে না! আরো মনে আছে জানো; সেই শান্ত গম্ভীর পূর্ণতার কথা —শোন জীবনের শেষ যুদ্ধযাত্রার আগের রাতে সুজার সেই কথাগুলো —পিয়ারাবানুকে বলা সেই কথাগুলো—

"আজ তবে হাসো; কথা কও, গাও—যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে ব'সে থাকতে! একবার শেষবার দেখে নেই, শুনে নেই। তোমার বীণাটি পাড়ো! গাও, স্বর্গ মর্ত্যে নেমে আসুক ঝঙ্কারে আকাশ ছেয়ে দাও। রসো অশ্বারোহীদের বলে আসি।"

[বাইরে দরজা খোলার শব্দ]

কালীনাথ॥ এ নিশ্চয়ই রামব্রীজ। আপনার প্রতিভা এখনো মরেনি চাটুজ্যেমশাই! ঠিক পুরোনোদিনের মতোই আছেন আপনি! ঠিক পুরোনো মতো!

রজনী॥ (দরজার শব্দের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে) ইধার এ রামব্রীজ, সিধা ইষ্টেজ পর চলে আও। (কালীনাথকে) বয়েস বেড়েছে তো কী হয়েছে কালীনাথ। এই তো জীবনের নিয়ম! (আনন্দে হেসে ওঠে) আরে তুমি কাঁদছ কালীনাথ, তোমার চোখে জল, কেন ভাই, কেন বলোতো? কাঁদছ কেন? আরে এস, এস, দূর কাঁদে নাকি! (বুকে জড়িয়ে ধরে জলভরা চোখে) শিল্পকে যে মানুষ ভালো বেসেছে

তার কাছে বার্দ্ধক্য নেই কালীনাথ, একাকীত্ব নেই, রোগ নেই, মৃত্যু ভয়কে তো সে হাসতে হাসতে ডাকাতি করতে পারে। (চোখের জল গড়িয়ে পড়ে) হ্যাঁ, কালীনাথ, আমাদের দিন ফুরিয়েছে। হায়রে প্রতিভা—কোথায় গেল! জীবনের পাত্র শূন্যতায় রিক্ত করে দিয়ে কোন দেশে কার কাছে গেল প্রতিভা, যাবার আগে আমাকে মজলিসি গল্পের আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দিয়ে গেল। আর তুমি! সারাজীবন থিয়েটারের প্রম্পটার হয়েই তোমার জীবন ফুরিয়ে গেল। চল কালীনাথ, চল যাই (যেতে আরম্ভ করে) জানো, সত্যি কথা বলতে কী, ওসব প্রতিভা টুতিভা আমার কিছু নেই। দিলদারের পার্টটা মন্দ করি না—তাও বছর কয়েক পরে আর মানাবে না আমাকে, তাই না? ওথেলোর সেই কথা গুলো তো মনে আছে তোমার—সেই যে—

"Farewell the tranquil mind ! Farewell content !
Farewell the plumed troops and the big wars
That makes ambition virtue ! O, farewell !
Farewell the neighing steed and the shrill trump,
The spirit stirring drum, th'ear-piercing fife,
The royal banner and all quality,
Pride, pomp and circumstance, of glorious war !"

কালীনাথ ॥ আমি বলছি রজনী চাটুজ্যে মরবে না, কিছুতেই না।

রজনী ॥ (যেতে যেতে) কিংবা ধরো—Macbeth-এর

"Life's but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more ;" (প্রস্থান)

[একেবারে নেপথ্য থেকে]

A horse ! A horse ! My kingdom for a horse !

[মঞ্চ ফাঁকা। ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে]

[পুনর্মুদ্রিত এই নাটিকাটি অভিনয় করার আগে নান্দীকার গোষ্ঠী মারফৎ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।]

বাইরের দরজা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

মঞ্জু
অশোক
কমল
পাহারাওয়ালা

নাটকটি ফ্যান্টাসি। সেকারণে মঞ্চ-বিন্যাস, আলোক-সম্পাত এবং ধ্বনি-সংযোজনে ফ্যান্টাসির নিজস্ব পরিমণ্ডলটি যাতে বাস্তবতার গানিতিক যুক্তি, সংস্কার ও নিয়মের প্রহারে নির্যাতিত না হয় সেদিকে পরিচালকের যত্ন বাসনা করছি। সমস্ত ঘটনা মঞ্জুর মনের ভিতরকার ঘটনা। মঞ্চে একটি ঘরের আভাসমাত্র থাকলেই চলবে। পর্দা উঠলে একটা ড্রেসিংটেবিলের সামনে বড় আয়নার মুখোমুখি মঞ্জুকে দেখা যাবে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের তারুণ্য মঞ্জুর মুখে-চোখে। মার্জিত চেহারা। হঠাৎ মঞ্জু নিজের প্রতিবিম্বের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে। মাইক্রোফোনে মঞ্জুর গলাতেই রহস্যময় চাপা যে কয়েকটি কথা ভেসে আসবে।

মাইক্রোফোন॥ মঞ্জু, আয়নায় নিজের ছায়াটিকে অত ক'রে কি দেখছ? —যেন তুমি নও, আর কেউ। তোমার মনের মধ্য থেকে যেন ও লুকিয়ে আয়নার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তাই না? ও তোমার সঙ্গে আজ নতুন খেলা খেলবে, তাইতো? তুমি রাজি না হলেই পারতে। দেখছনা, ছায়াটা কেমন অদ্ভুত হাসছে, যেন একটা ভয়ংকর বিপদের

* গন্ধর্বে [শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭২] প্রকাশিত নাটকটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পুনঃ প্রকাশিত হোল।

খেলায় তোমাকে চোখের ইশারায় ডাকছে। [মঞ্জু ঘরের চড়া আলোটা নিভিয়ে মৃদু নীল আলোটা জ্বালে] ও, তাহলে তুমিও খেলাটা চাও। বেশ। মঞ্জু, এতবড় বাড়িটায় কেবল তুমি একা জেগে আছ। একতলার বাইরের দরজাটা এত রাত্তিরে এখনো খোলা রেখেছ, তাই না? [মঞ্জু ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানায়] ঐ বাইরের দরজা দিয়ে এত রাত্রে কেউ আসুক, তাই চাওতো? কে আসবে—কমল? খুব সাহসতো তোমার। [মঞ্জু মিষ্টি হাসে] কমল তোমাকে খুব ভালোবাসে, তাইনা? [মঞ্জু মাথা নাড়ে]। মঞ্জু, দ্যাখো, আয়নায় তোমার ছায়াটা দরজার দিকে যাচ্ছে, বোধহয় কমল আসছে, যাও, দরজাটা খুলে দাও। কমল আসছে।···

[মঞ্জু প্রায় দৌড়ে জানলার কাছে গেল। জানলার কাছ থেকে ঘরের মধ্যে এল। ওর মুখে সুখ, ব্যস্ততা। কি করবে যেন স্থির করতে পারছে না। আয়নার কাছে গিয়ে নিজেকে দেখল। চুলটা একটু মনের মত করল। আঁচলে মুখটা মুছে নিল। গুনগুন করে গাইল কিছু। তারপর এক্ষুনি কি করবে ভেবে না পেয়ে চিন্তিত হল। বাইরে জুতোর শব্দ ক্ষীণ আসছে কান পেতে শুনল। মাথায় যেন বুদ্ধি এল। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করল। দরজার কাছে কান পেতে থাকল। দর্শকের দিক থেকে ওর পিঠ আর খোলাচুল, লম্বা সুঠাম শরীর দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। তীব্র দ্রুত, দরজায় পিঠ চেপে ঘুরে দাঁড়াল মঞ্জু। এবার ওর সমস্ত মুখে উদ্ভাসিত সুখ, ভালবাসায় চঞ্চল রহস্যময় উদ্ভাসিত সুখ। দরজায় আবার টোকা পড়ল।]

মঞ্জু॥ আমি খুলব না ত! কি ছোটলোক ছেলে তুমি! এত রাত্তিরে কেউ আসে?

[জোরে টোকার শব্দ হল]

বাইরের দরজাটা খুলে রাখব, এ ত আমি মজা করেও বলতে পারি। তোমার মনে এত ভয়ংকর লোভ। তুমি আসতে পার, ব্যস এইটুকুই আমি বুঝতে চেয়েছি, এবার পালাও ত।

[শব্দ জোরে হল।]

দরজাটা ভেঙে ফেলবে নাকি? খুলব না, কি করবে তুমি! সেই থেকে ঠক্‌ঠক্ করে যেন হাতুরী পিটে যাচ্ছ। মুখে কথা নেই বুঝি, বোবা হয়ে গেছ? সারাদিন ত কথার জ্বালায় মুখে লাগাম বেঁধে রাখতে ইচ্ছে করে। শোন, বেশ মজা লাগবে, আমি এখান থেকে আর তুমি দরজার ওপাশ থেকে যেমন খুশি কথা বলে যাব।

[শব্দ আরো জোরে হল।]

কি আরম্ভ করেছ? বাবা উঠে পড়লে বুঝবে মজা। কোনদিন কাণ্ডজ্ঞান হল না তোমার। দাঁড়াও খুলছি। যেন পিছে আড়াইশ ভূত তাড়া করেছে!

[দরজা খুলল। দরজার কাছে একজন পাতলা লম্বা চেহারার ছেলে এসে দাঁড়াল। একটু ক্লান্ত দেখতে, যেন অনেকদূর হেঁটে এসেছে। মঞ্জু ওর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে এবং ভয়ে যেন স্তব্ধ। তারপর ওকে শুদ্ধ দরজা বন্ধ করে প্রায় ঠেলে যেন ঘরের বাইরে করে দিতে চাইল। ছেলেটি অল্প চেষ্টায়, ঘরে ঢুকে পড়ল। চারদিকটা দেখতে লাগল। মঞ্জু সরে এসে দূরে দাঁড়াল। ওর নিঃশ্বাস জোরে পড়ছে। চোখে ক্ষুব্ধ এবং অসহায় ভাব।]

মঞ্জু ॥ কে আপনি?

ছেলেটি ॥ অন্তত কমল নয়। আমার নাম সমর, প্রদীপ, রজত, শৈলেন বা কিছু হতে পারে। তবে অশোক বলে ডাকতে পারেন, কারণ এ-নামটা আপনার ছোটবেলা থেকে ভাল লাগে, লাগে না?

মঞ্জু॥ আপনি একটা অপরিচিত বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে ঢুকে পড়লেন যে?

অশোক॥ অপরিচিত এই পৃথিবীটাতেও আমরা সকলে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়ি নি? বসি, কি বলেন? এত হেঁটেছি! বসি?

মঞ্জু॥ না, আপনি চলে যান। আশ্চর্য সাহস ত আপনার?

অশোক॥ ভয়ানক ভীতু আমি। বোকা, অপদার্থ! নাহলে আমি যে আপনাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি, ত্রিশটা বছর আপনাকে কিছু বলার জন্য প্রাণান্ত চেয়েছি—সে কথা জানাতে সাহস করে কি একবারও আসতে পারতাম না।

মঞ্জু॥ যা তা বলছেন আপনি! কোন মানে হয় না!

অশোক॥ হয়। মিথ্যে আমি বলি না। আমি কিন্তু বসে পড়লাম। (বসে) এত সুন্দর আপনার ঘর। আর এত চমৎকার আপনার চিবুক। আপনার গলার কাছের তিলটায় এখনো আমার দারুণ লোভ। আমি যদি মরে গিয়ে ঐ তিলটা হতে পারতাম, আপনি কিছুতে সরিয়ে দিতে পারতেন না আমাকে, আমি আপনার গায়ের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে চিরটাকাল মিশে থাকতাম।

মঞ্জু॥ অত্যন্ত রুচিহীন আপনার কথাবার্তা।

অশোক॥ আমি যে আপনাকে ভালবাসি সে কথাটা বিশ্বাস করলে বিন্দুমাত্র রুচিহীন মনে হবে না আমাকে। আপনার মনে হবে, আমি একটা ভয়ানক আবেগে বলবান লোক, মেয়েরা ত এই আবেগই ভালবাসে।

মঞ্জু॥ আপনার তত্ত্বকথা শোনার একবিন্দু স্পৃহা নেই আমার। আপনি চলে যান। নাহলে আমি বাবাকে ডাকব। পুলিশে দেওয়া উচিত আপনাকে।

অশোক॥ আমার কি দোষ! আপনি নিজেই ত বাইরের দরজাটা খুলে রেখে এলেন? আপনি চাননি, কেউ আসুক। কোন ভয়, বিপদ?

আপনি আমাকে চাননি ?—যে আপনাকে একটা বিপজ্জনক ভয় ধরান পথে হাঁটতে হাঁটতে তুমুল ভালবেসে যাবে। আপনি কি জানেন না, কমল আপনার কাছে ক্রমশ পুরনো, নিরাপদ আর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

মঞ্জু॥ না, কমলকে আমি ভালবাসি। বেশ ভালবাসি।

অশোক॥ ভাল ত আপনি জ্যোৎস্নাকেও বাসেন, ফুলকেও বাসেন, বাবাকেও বাসেন, ডালমুটকে বাসেন, ফুলকপির সিঙ্গাড়াকে বাসেন, পেট্রোলের গন্ধকে বাসেন—কিন্তু ওরাও ত ক্লান্ত করে, ফুরোয়। একদৃষ্টে পৃথিবীর দিকে কে তাকিয়ে থাকতে পারে ? ঘাড় ফেরাতে হয়। আর কমলের দিক থেকে ঘাড় ফেরালেই আমি। তাকান আমার দিকে ; আমার হাতের ভয়ানক লাল লোভের মধ্যে আপনার মুখটা ধরতে দিন, দেখবেন, আমাকে আপনি চেনেন। আপনার রক্ত চেনে, আপনার বুকের ভিতরের বেহিসেবি আবেগের নিঃশ্বাস চেনে, আপনার ভালবাসার চোখ চেনে, আপনার মুঠোয় মধ্যে চেপে ধরার গোপন ইচ্ছেগুলো চেনে। তাকান আমার দিকে ; তাকান। আপনি চেনেন আমাকে, চিনতে চেষ্টা করুন, স্বীকার করুন।

মঞ্জু॥ না, চিনি না, চিনি না আপনাকে আমি। চিনতে চাই না।

অশোক॥ (হেসে উঠল। কোণের ইজিচেয়ারটায় শুয়ে পড়ল) চিনতে চাই না, তাই বলুন। এত অসহায় লাগছে আপনাকে। ভাল লাগছে। আমিও কম অসহায় নই। সারা জীবন ধরে কারুর উদ্ভাসিত কপাল থেকে একটা চুল সরিয়ে দিতে পারলুম না। একটা ইস্পাতের সিন্দুক ভেঙে ফেলা যায় কিন্তু পাঁচটা নরম মেয়েলি আঙুলের শক্তমুঠি খোলার শক্তি হয় না অনেকের। হাজার কামানের শব্দেও উঠোনের রোদ একবিন্দু কাঁপে না। ভাবলে কি রকম অসহায় হতে হয় বলুন।

মঞ্জু ॥ আপনার পায়ে পড়ি আপনি চলে যান। হয়ত কমল এসে পড়বে। ও আমাকে ভুল বুঝবে। বলা যায় না ও এসে পড়তে পারে।

অশোক ॥ ওর জন্যই আমি বসে আছি।

মঞ্জু ॥ তার মানে? ওকে চেনেন আপনি?

অশোক ॥ বিলক্ষণ। বহুদিনের চেনা।

মঞ্জু ॥ আপনি কি ওর বন্ধু?

অশোক ॥ কি দুঃখে বন্ধু হতে যাব। আমি একটা গোলমাল করতে চাই।

মঞ্জু ॥ বুঝতে পেরেছি, বিশ্রী রকম কি একটা উদ্দেশ্য রয়েছে আপনার।

অশোক ॥ উদ্দেশ্য একটা আছে।

মঞ্জু ॥ কিন্তু কি দোষ করেছি আপনার কাছে আমি?

অশোক ॥ আপনি আমাকে ভালবাসেন নি কেন?

মঞ্জু ॥ আপনাকে চিনি না আমি কোনকালে, দেখিনি পর্যন্ত।

অশোক ॥ বললুম ত চেনেন আমাকে, জানেন—মেনে নিতে পারছেন না। আমার অপরাধ কি জানেন, বড্ড অসময়ে এসে গেছি। ঠিক সময়টাতে এসে পড়তে পারলে, আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চাই। ও হ্যাঁ মনে পড়েছে দরজার বাইরে আমার বাক্সটা রেখে এসেছি, নিয়ে আসুন না, হাল্কা আছে।

মঞ্জু ॥ আপনি কি পেয়েছেন আমাকে! যেন জুলুম করতে চাইছেন?

অশোক ॥ বাক্সের জিনিসগুলোতে আপনারই লোভ বেশি। যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায় তাহলে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলব ইচ্ছে আছে।

মঞ্জু ॥ আপনাকে শেষবারের মত বলছি, আপনি চলে যান।

অশোক ॥ বাক্সের জিনিসগুলোতে আপনার কৌতূহল নেই?

মঞ্জু ॥ না। আপনি চলে যান।

অশোক ॥ বাক্সে আপনার কিশোর বেলার শরীরটা মমি করে রাখা আছে।

দেখবেন? আনব? আর আপনার তখনকার মন, যা একটা চড়ুই পাখির মত সারা ঘরে উড়ত।

মঞ্জু॥ আপনি একজন বদ্ধ উন্মাদ।

অশোক॥ ছোটবেলার সেই জামগাছটা মনে আছে? একদিন বৃষ্টিতে প্রচুর জাম খেয়ে জিভটা কি দারুণ মজার নীল হয়েছিল, মনে আছে? ঐ মমিটার জিভও নীল। ফ্রক পরতেন, ঐ মমিটার হাঁটুর কাছে একটা মিষ্টি কাটা দাগ আছে, বুড়ি বসন্ত খেলতে গিয়ে পড়ে গিয়ে ভয়ানক কেটে গিয়েছিল, সেই দাগটা হয়ত এখনো আপনার সঙ্গে আছে।

মঞ্জু॥ আপনি চলে না গেলে আমি চেঁচাব।

অশোক॥ একদিন আপনি আপনার মায়ের বিয়ের বেনারসী পরেছিলেন। প্রচুর বৃষ্টি পড়ছিল। আপনি শাড়িটা কার জন্য পরেছিলেন?

মঞ্জু॥ নিজের জন্য।

অশোক॥ মিথ্যে কথা। ঐ বাড়িতে একটি ছেলে বিয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরী করত আপনার ছোড়দার সঙ্গে। উঠোনের লাল করবী ফুলগুলো তখন কার জন্য ভাল লাগছিল?

মঞ্জু॥ আমার নিজের জন্য।

অশোক॥ মিথ্যে কথা। সেদিনের ফুলগুলো বাইরের বাক্সটার মধ্যে আছে, ওদের যদি ডেকে আনি। বৃষ্টি, বয়স, রক্তের চিৎকার, এই সব কিছুতে উদভ্রান্ত ছেলেটি হঠাৎ ঐ বেনারসী শুদ্ধ আপনাকে যখন পাগলের মত ভালবেসে অস্থির করে তুলেছিল, তখন তাকে 'রাক্ষস' বলেছিলেন মনে আছে?

মঞ্জু॥ (ভীতের মত) আপনি অভদ্র, যা তা বলছেন।

অশোক॥ সেদিন প্রথম পুরুষের আদর লেগে আপনার হাত পা মুখ অন্ত মানুষের মত হয়েছিল, রক্ত আরো লাল। সেই রক্তকণিকাগুলো

আমি একটা শিশিতে করে ঐ বাক্সটায় স্পেসিমেন হিসেবে নিয়ে এসেছি। একদিন ছাদে মায়ের সঙ্গে বসে আমসত্ত্ব দিয়েছিলেন, রোদে সারা মুখটা টুকটুকে হয়ে উঠেছিল। সেই লালচে রঙ আমসত্ত্বের গন্ধের সঙ্গে মিশিয়ে তুলোর বাক্সে জড়িয়ে নিয়ে এসেছি। আর আপনার প্রথম মেলে-ওঠা সেই মেয়েলি চোখ যা সেদিনের কোটি কোটি ক্যামেরায় ধরাও সম্ভব ছিল না, তার নেগেটিভ রয়েছে। বাক্সটা নিয়ে আসব ?

[মঞ্জু, টেবিলের কাছে চেয়ারটায় বসে মাথাটা নিচু করল।]

বাক্সের জিনিসগুলো তাহলে পছন্দ হচ্ছে। আমি এবার 'তুমি' বলব।

মঞ্জু ॥ (চকিতে মাথা তুলে) না, বলবেন না। (চোখ অসহায়) আমাকে 'তুমি' করে বলবেন না। কি দরকার। কি লাভ।

অশোক ॥ উপায় নেই মঞ্জু। আমরা কেউ কাউকে ক্ষমা করব না। আমি অনেক হারিয়েছি। আমার গায়ে জীবন্ত মানুষের টগবগে রক্ত নেই, আমার মানুষের মত সচল ছায়া পড়ে না। প্রেতের মত আমার পা উল্টো, আমি সামনের দিকে চলতে পারি না, আমার হাতের রেখা মুছে গেছে। আমি একটা গোটা মানুষ হতে চাই। যদি এখন তোমার সেই কিশোর বেলায় মেঘ ডেকে ওঠে ; তারপর হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামে, আমি তোমাকে নিয়ে ঐ বাক্সটা হাতে চলে যাব। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আমি এসেছি। তুমি না গেলে আমি নড়ব না।

মঞ্জু ॥ আমি কোথাও যাব না। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি যান। এক্ষুনি কমল আসবে হয়ত। আপনি কি চান, আমার সবকিছু ভেঙেচুরে যাক।

অশোক ॥ আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে। আমি আর কিছু বুঝি না, জানি না।

মঞ্জু ॥ আমি যাব না।

অশোক ॥ আমি উঠব না।

মঞ্জু ॥ আমি চিৎকার করব।

অশোক ॥ তুমি কত জোরে চেঁচাতে পার আমি শুনব। (জানলার কাছে গেল) জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমিও তোমার দ্বিগুণ চেঁচাব। আজকাল চেঁচাতেই আমার ভাল লাগে।

মঞ্জু ॥ জানলার কাছে যাবেন না। যাবেন না বলছি।

অশোক ॥ কেন?

মঞ্জু ॥ একটা লোক এসে রাস্তায় রোজ দাঁড়ায়। আমার জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনাকেও দেখতে পাবে। লোকটা হয়ত ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

অশোক ॥ দেখলে ক্ষতি কি?

মঞ্জু ॥ অনেক ক্ষতি, বুঝবেন না আপনি। অন্তত আপনি সরে এসে ভিতর দিকে বসুন। জানলাটি বন্ধ করে দিন।

অশোক ॥ জানলাটা খোলাই থাক। বরঞ্চ চড়া আলোটা জ্বেলে রাখি। আমি নিজেকে সকলের কাছে এখন প্রকাশ করতে চাই। আমি নিজেকে দেখাতে চাই, দেখতে চাই। আমি তোমার সঙ্গে আছি, সকলে দেখুক। এর ওর কান হয়ে সমস্ত পৃথিবীতে হৈ চৈ করে ছড়িয়ে পড়ুক।

মঞ্জু ॥ কিন্তু ঐ লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। রোজ রোজ ও জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়ত এখনও জানলাটা খোলা দেখে তাকিয়ে আছে। একটু আড়াল থেকে দেখুন না, লোকটা আছে কিনা।

অশোক ॥ (বাইরে লুকিয়ে তাকিয়ে) হ্যাঁ অন্ধকারে স্থির চোখে একটা

লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন এ-ঘরে আসি ও আমাকে দেখছিল, পথের এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল।

মঞ্জু ॥ পাহারাওয়ালাদের মত পোষাক। জ্যোৎস্নার রাত্তিরে একদিন ভাল করে তাকিয়ে দেখেছি—মুখটা কেমন অদ্ভুত, চোখ দুটো বড় বেশি দেখে, ঠোঁট পুরু, ভয়ংকর নির্বিকার মুখ। এত ভয় করে আমার। মনে হত আমার কোন গোপন সংবাদ ও জানে, একটা ভৌতিক ভয়ে আমি বাবাকে পর্যন্ত বলতে পারিনি। কিন্তু ও লোকটা যদি রোজ রোজ এমনি এসে দাঁড়ায়, আমি মরে যাব!

অশোক ॥ আমার সঙ্গে যদি তুমি চলে যাও, ও আর আসবে না। ওর হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে। (কিছু ভেবে) কিন্তু রেহাই নাও পেতে পার, তোমাকে লুকিয়ে লাভ নেই, ঐ পাহারাওয়ালার মত লোকটাকে হঠাৎ আমিও দেখতে পাই গলির আকস্মিক মোড়ে, দোকানে ব্লেড কিনতে গিয়ে, মোটরের মারমুখী চাকার কাছ দিয়ে দ্রুত পাশ কাটিয়ে, অনেক রাত্তিরে একা ছাদে দাঁড়িয়ে। লোকটা যেন আমাকে লক্ষ্য করছে, অনুসরণ করছে, যেন ওর নোটবুকে টুকে নিচ্ছে। এত অস্বস্তি হয়।

মঞ্জু ॥ কি চায় লোকটা? আমি বুঝতে পারি না, কিছুতে না।

অশোক ॥ হয়ত কিছুই চায় না, আমাদের পাহারা দেবাই ওর কাজ। মাথার উপরে বজ্রের থেকেও সাংঘাতিক আমাদের সব কিছুর উপর একটা চোখের ঘুরে বেড়ানো। জান মঞ্জু, আমি লক্ষ্য করেছি, কমলকেও ও বিরক্ত করে। ওর বাড়ির জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। পিছে পিছে নিঃশব্দে হাঁটে, যখন একা পায়, ওর পিছু ছাড়ে না। কমল বলে নি তোমাকে?

মঞ্জু ॥ না ত।

অশোক ॥ তার মানে কমল তার সব কিছু তোমাকে দেয় নি। তার অস্বস্তি, দুর্ভাবনা, বিরক্তি। অথচ আমি তোমাকে আমার সম্পূর্ণ দিয়ে ছুঁতে চাইছি। (হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে) মঞ্জু, তোমার কমল অনেকদিন বাঁচবে। বোধ হয় ও আসছে। যেন দৌড়ে আসছে।

মঞ্জু ॥ (অশোকের হাত ধরে জানলার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে) জানলার কাছ থেকে সরে আসুন, হয়ত কমল দেখতে পেয়েছে। কি হবে এখন! বললুম, আপনি চলে যান।

অশোক ॥ আমাকে জানলা থেকে সরিয়ে কি লাভ? কমল ত ঘরে এলেই আমাকে দেখবে।

মঞ্জু ॥ আমার একটা অনুরোধ রাখুন, আপনার পায়ে পড়ছি—আপনি পাশের ঘরটায় যান! যান না, একটা অনুরোধও রাখবেন না আপনি আমার!

অশোক ॥ বেশ, যাচ্ছি। কিন্তু কয়েক মিনিটের বেশি থাকলে কিন্তু হাঁপিয়ে উঠব আমি।

মঞ্জু ॥ কমলকে আমি চলে যেতে বলব, যত তাড়াতাড়ি পারি। আপনি যান। ভিতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে দেবেন, কেমন? যাগ, ওর শব্দ পাচ্ছি। যান।

[অশোক আস্তে আস্তে পাশের ঘরটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করল। হঠাৎ টেবিলে সিগ্রেটের প্যাকেটটা পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত মঞ্জু তুলে নিল। বন্ধ-দরজায় টোকা দিয়ে, ব্যস্ত বিব্রত চাপা গলায়।]

শুনুন, আপনার সিগারেট প্যাকেটটা নিন, প্যাকেটটা নিন না তাড়াতাড়ি।

[দরজা বন্ধ। অন্যদিকের দরজা খুলে যাবার শব্দ হতেই মঞ্জু ফিরে তাকিয়ে কমলকে দেখল। মঞ্জুর হাতে সিগ্রেটের প্যাকেট। কমল প্যাণ্ট শার্ট পরা একজন সুদর্শন যুবক। মুখটা শান্ত।]

মঞ্জু ॥ (হাসবার চেষ্টা করে) কমল তুমি আসবে আমি জানতাম, তবু কেমন ভয় হচ্ছিল যদি সব কিছু আমার পাগলামি ভেবে না আস।

কমল ॥ তোমার পাগলামির খেলা দেখতে এলুম! কিন্তু আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

মঞ্জু ॥ (সন্ত্রস্ত মনে) কিসের সন্দেহ?

কমল ॥ বাইরের দরজা খুলে রেখে, ঘরের দরজায় সব কটি খিল খুলে দিয়ে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিপদ ঘরে ডেকে আনতে যে চায়, তার মাথার সুস্থতায় আমার সন্দেহ আছে।

মঞ্জু ॥ মজার লাগছে না? প্রত্যেক দিনটা কত এক ঘেয়ে। একটা নতুন রকম কিছু ত ভেবে বের করলুম।

কমল ॥ নতুন রকম? হ্যাঁ তা ত বটেই, যেমন তোমার হাতে সিগ্রেট। একেবারে অভিনব!

মঞ্জু ॥ (ব্যস্ত ভাবে) ও, এটা...তোমার জন্য কিনলুম। কেমন অবাক লাগছে, না?

কমল ॥ আমি যে সিগ্রেট খাই না, তা ত তুমি জান, বাজে পয়সা খরচ করেছ।

মঞ্জু ॥ আজ থেকে খাবে তুমি, পুরুষ মানুষ সিগ্রেট না খেলে এত খারাপ লাগে! এক্ষুণি খাও, আমার কাছে বসে।

কমল ॥ খাব? বলছ, (প্যাকেট খুলে) তুমি এমন কৃপণ, মাত্র তিনটে সিগ্রেট কিনেছ। অন্তত এক প্যাকেট ত কিনবে।

মঞ্জু ॥ শুরুতেই একটি প্যাকেট চাই। আমি যে কটা কিনে দেব, তার বেশি একটাও পাবেনা, বুঝলে।

কমল ॥ তথাস্তু। কিন্তু দেশলাই।

মঞ্জু ॥ দেশলাই ত নেই। ওটা ত কিনি নি। দাঁড়াও বাড়ির ভিতরে আছে কিনা দেখি।

কমল ॥ যেতে হবে না! বস ত এখানে (মঞ্জু বেশ কাছাকাছি বসল), আসলে আমি সিগ্রেট খেতে আরম্ভ করি এটা ধূমপানের দেবতা চান না, তুমিও চাও না—ফলে দেশলাই নেই। ছেড়ে দাও। তুমি কাছে থাকলে, কোন বোকা সিগ্রেট খায়!

মঞ্জু ॥ তবে কি খাবে? খুব সাহস, না!

কমল ॥ তেমন একটা রাক্ষস হতে পারলুম কৈ? রাক্ষস হওয়াও ত একটা সাধনা। রীতিমত ব্যায়ামের দরকার।

মঞ্জু ॥ আচ্ছা, কমল, একটা পাহারাওয়ালার মত লোক বাড়ির সামনেটায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলে?

কমল ॥ ছিল, কেন বলত?

মঞ্জু ॥ ওকে তুমি আগে কখন দেখেছ?

কমল ॥ এখানে সেখানে দেখেছি।

মঞ্জু ॥ মনে হত না, তোমাকে অনুসরণ করছে, তোমার পিছু নিয়েছে?

কমল ॥ তুমি জানলে কি করে?

মঞ্জু ॥ তুমি আমাকে যা লুকোও আমি জানতে পারি।

কমল ॥ আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে বলিনি। ভেবেছি এটা তেমন একটা কিছুই নয়। তোমাকে বললে ছেলেমানুষের মত ভয় মিশিয়ে কিছু ভাববে। তোমার অশান্তি বাড়ত, অকারণ বাড়ত।

মঞ্জু ॥ তুমি হয়ত এ-রকম অনেক কিছুই বল না!

কমল ॥ বলি না। যা তোমার দরকার নয় তার অনেক কিছুই বলি না।

মঞ্জু ॥ কিন্তু আমি তোমার সব কিছু জানতে চাই। তোমার অফিসে কি সমস্যা হল, রাস্তার কোন লোকটার মুখ অদ্ভুত লাগল, কোন ইঁটটায় তোমার জুতো ভয়ানক ঠোকর খেল, কোন সময় আকাশটা ভাল লেগেছিল—সব শুনতে চাই আমি। সব, তোমার সব কিছু।

কমল ॥ এত ছেলেমানুষ তুমি! নয়ত কেন এই মাঝরাতের পাগলামিতে

যাবে। কিন্তু, পাহারাওয়ালার মত দেখতে লোকটা আমার পিছে পিছে থাকে, তুমি জানলে কেমন করে।

মঞ্জু॥ ও যখন আমার জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন নিশ্চয়ই তোমার উপরেও নজর আছে। এ ত সহজ হিসেব। আমরা দুজন কি আলাদা?

কমল॥ লোকটা এমন অস্বস্তিকর, এক এক সময় ইচ্ছে করে অন্ধকার একা পথে ওকে ধরে গলাটা টিপে মেরে ফেলি। ওকে দেখলে মনে হয়, আমি খুনীও হতে পারি।

মঞ্জু॥ কি বলছ তুমি! তোমার চোখ দুটো কি ভীষণ লাল দেখাচ্ছে।

কমল॥ ঠিক বলছি, লোকটা আমাকে অসহ্য করে তুলেছে। নির্বিকার একটা মুখ, দুটো প্রখর চোখ, মুখে কথা বলতে শুনিনি, হাঁটাটা যেন অলৌকিক, অনুক্ষণ যেন পিছনে দূর দিয়ে হেঁটে হেঁটে লক্ষ্য করছে। যেন আমার সব কিছুর উপর পাহারাদারী চলছে। আমি কি স্বাধীন নই, মুক্ত নই?

মঞ্জু॥ ঠিক আমারো এরকম অস্বাস্ত হয়, কমল। লোকটার হাত থেকে আমাদের মুক্তি দরকার। আমিও ওর চোখ দুটোকে সহ্য করতে পারি না।

[হঠাৎ দরজা খুলে অশোক ঢুকল। মঞ্জু আতঙ্কগ্রস্ত। কমল অনেকটা বিমূঢ়। অশোক খুব শান্তভাবে ওদের টেবিলের কাছে এল। সিগ্রেটের প্যাকেটটা তুলে নিল।]

অশোক॥ (কমলের দিকে তাকিয়ে) এটা আমার। (মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে) ভিতরে যাচ্ছি। সময়টা বড্ড বেশি নিচ্ছ।

[চলে যেতে থাকে অশোক]

কমল॥ আপনাকে চিনতে পারলাম না।

মঞ্জু॥ উনি আমাদের একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয়। বেড়াতে এসেছেন।

কমল ॥ ও, নমস্কার।

অশোক ॥ নমস্কার। আপনি কমলবাবু, আমি চিনি। মানে চিনে নিয়েছি।

কমল ॥ মঞ্জু বলেছে, নিশ্চয়ই।

অশোক ॥ না, আপনাদের পথে ঘাটে দেখেছি। দুঃস্বপ্নেও দেখেছি! মঞ্জুকে আজ নিয়ে যেতে এসেছিলাম।

কমল ॥ ও, কোথাও বেড়াতে নিশ্চয়ই। কোথায় থাকেন আপনি?

অশোক ॥ মঞ্জু, কোথায় থাকি আমি?

মঞ্জু ॥ আপনি কোন কথা বলবেন না আমার সঙ্গে। কমল, তুমি যদি আমাকে বিন্দুমাত্র ভালবাস, ওর কথা বিশ্বাস কর না। যা খুশি তাই বলছে। বাইরের দরজাটা খোলা ছিল, হঠাৎ ঢুকে পড়েই সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে।

কমল ॥ আমি আসার পরেই ওর কথা ত বলনি।

অশোক ॥ কথা ছিল, আপনাকে ও তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দেবে। দেরী দেখে সিগ্রেটের অভাবে আমাকে বাইরে আসতেই হল। উপায় ছিল না। তা ছাড়া আমার সিগ্রেটের প্যাকেটটা নিয়ে মঞ্জুর প্রেম-প্রেম খেলাটা আমার এত কুৎসিৎ লাগছিল!

মঞ্জু ॥ কমল, আমার আর কোন উপায় ছিল না তখন। আমি কি করব বুঝে উঠতে পারি নি। বিশ্বাস কর কমল, আমি তোমাকে সব বলতাম। হঠাৎ বললে তুমি যদি কিছু বুঝতে না চেয়েই চটে ওঠ, তাই অনিচ্ছায় মিথ্যুক হতে হয়েছে। তুমি আমাকে ভুল বুঝবেনা, আমি জানি। তুমি ওরকম গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ কেন?

কমল ॥ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মঞ্জু। কেবল মনে হয় সব কিছু বড় বেশি জটিল। লোকটি যদি না বেরিয়ে পড়ত, হয়ত ওর কথা

আমাকে বলতেই না। এওতো হতে পারে। তুমিও কি আমাকে সব বলো?—না মঞ্জু, আমি কিছু বুঝিনা।

অশোক॥ আমাকে নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে আপনাদের। কিন্তু পৃথিবীর মিথ্যেগুলো আমার যেন না দেখালে নয়। আমি কি করব? কোন দোষ করিনি, অথচ সব এধার ওধার চলে গেল। আমি দূরের কারুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখি ফোনের তার কে কেটে দিয়ে পালিয়েছে। টেলিগ্রাফের পোস্ট তার সমেত একটি কোকিলের ভারে কোথায় ভেঙে ছিঁড়ে গেছে। চারিদিকটা এত ছত্রাখান, এত ভাঙা; আমারও ইচ্ছে করে সব ভাঙতে, ছড়াতে। সব কৃত্রিমতা মিথ্যে হৈ-চৈ করে চোখের সামনে তুলে ধরতে। এ এক রকমের নেশা। বিপজ্জনক নেশা।

মঞ্জু॥ আপনার এলোমেলো কথা অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। আপনি এখন অন্তত যান। আমাকে একটু শান্তি দিন।

অশোক॥ পরে আসার সময় পাব কিনা কে জানে। এই ত কত বছর পর সময় হল। তাছাড়া মরেও ত যেতে পারি। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি চল।

কমল॥ কি বলছেন আপনি। আপনার দাবিটা একটু জুলুমের মত শোনাচ্ছে না।

অশোক॥ জুলুম ছাড়া কিছু মেলে না। আমি অনেক ভিক্ষে করেছি, গ্লানি কাকে বলে জানি। মঞ্জু যদি আমার সঙ্গে না যায় ওর অনেক-কিছু আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে। আমার ভারি লাগে—একা একা বইতে কষ্ট হয়। যেমন ওর গাল, চিবুক, শরীর, আমার গায়ে মুখে ঠোঁটে লেগে দশ বছর আগে যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল তার সবটুকু আগুন ওকে ফিরিয়ে নিতে হবে। অনেকগুলো পুরণো দিন অদ্ভুত সব রঙিন কাঁচের বেলুনের মত বুকের মধ্যে সুতোয় ঝুলছে সেগুলি ওর খুলে নিতে হবে।

শরীরের কোথায় একটা পেরেক ফুটে আছে ওকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমি শান্তি ফিরে পাব।

কমল ॥ মঞ্জু, তুমি আমাকে অনেক কিছু বল নি।

মঞ্জু ॥ বলার মত কিছু নয়, কিছু ছিল না। তাছাড়া তুমিও আমাকে অনেক কিছু বলনি। আমি বুঝতে পারি, কি সব লুকোও, তা না হলে পাহাড়াওয়ালা লোকটাকে তুমি ভয় পাবে কেন ?

কমল ॥ আমার শরীরটা খারাপ লাগছে, আমি চলে যাব। ভয়ানক খারাপ লাগছে।

মঞ্জু ॥ আমাকে একা রেখে তুমি কোথায় যাবে, কমল।

কমল ॥ আমার সঙ্গে দেখা হবার আগেও তুমি একা ছিলে। (একটু থেমে) কিংবা ছিলেনা।

মঞ্জু ॥ তুমি এসব কি বলছ ?

কমল ॥ আমি জানি না কি বলছি। কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

[ভেজান দরজাটায় দু একটা টোকা শোনা যেতে ওরা দুজনে চমকে তাকাল। অশোক শান্তভাবে একটা সিগ্রেট ধরাল।]

মঞ্জু ॥ কে ?

[উত্তরের বদলে আবার টোকার শব্দ]

অশোক ॥ আমার মনে হয় সেই পাহাড়াওয়ালা লোকটা।

[ধোঁয়া ছেড়ে বসল।]

মঞ্জু ॥ তার মানে ?

কমল ॥ যদি আসে ভালই হয়, অনেকদিনের বিরক্তির শোধ নেয়া যাবে। যেন আমার সব কিছু গোপনতার উপর টর্চলাইটের মত দুটো চোখ সজাগভাবে ফেলে রেখেছিল। কিন্তু কোন সাহসে এল লোকটা ?

অশোক ॥ আমি যখন ও ঘরে ছিলাম, হাত নেড়ে লোকটাকে ডেকেছিলাম, বোধ হয় তা-ই এল।

মঞ্জু ॥ আপনি ত নানাভাবে জ্বালাচ্ছেন। আবার একটা নতুন উপদ্রব এনে হাজির করলেন। আমার সমস্ত শরীরটা লোকটাকে দেখলে ভয়ে কেঁপে ওঠে।

অশোক ॥ ঐ পাহাড়াওয়ালাটা আমারও শত্রু। আমাকেও সারাজীবন চৌকি দিয়ে যেন গণ্ডীর মধ্যে নজরবন্দী করে রেখেছে। আমাকে স্বাধীন হতে দেয়নি। হাত পা ওর কাছে যেন বাঁধা রেখেছি। আমার প্রচণ্ড রাগ। তোমারও এ রকম রাগ আছে ওর উপর মঞ্জু, তুমি চাও না ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে? চাওনা?

মঞ্জু ॥ চাই।

কমল ॥ তাহলে ও আসুক। ও কি চায় আমাদের কাছে জানতে হবে আমাকে। ও যদি আমাকে না ছেড়ে দেয়, ওকে আমিও ছাড়ব না। মঞ্জু দরজাটা খুলে দাও।

মঞ্জু ॥ আমি পারব না।

অশোক ॥ বেশ, আমি খুলছি। দেখছি, আমিও সাহসী।

[অশোক দরজা খুলে দিতে আস্তে আস্তে নিতান্ত রহস্যময় দেখতে একটি লোক ঢুকল। খাঁকি জামাপ্যান্ট ও সার্টে অনেকটা পুলিশের মত দেখতে। মুখ নির্বিকার। দুটো চোখ অর্থহীন অথচ প্রখর। ঠোঁট পুরু। হাঁটা মন্থর, ভারি এবং স্বপ্নাচ্ছন্ন। লোকটিকে পরিচিত পৃথিবীর স্পষ্ট কেউ বলে মনে হবে না। সকলের চোখের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসল, নিঃশব্দে।]

অশোক ॥ বসুন।

[লোকটি বুঝল না। দাঁড়িয়ে থাকল।]

কমল ॥ (আঙুল দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে) বসুন চেয়ারে।

[এবার আস্তে গিয়ে বসল।]

কমল ॥ আপনি কি চান আমাদের কাছে?

[লোকটি চুপ।]

অশোক॥ আমার কাছে কি দরকার আপনার ?

মঞ্জু॥ আপনি আমার জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন কেন ?

[লোকটি চুপ।]

অশোক॥ (ঝাঁকি দিয়ে) কথা বলছেন না কেন ?

কমল॥ কথা বলুন ?

মঞ্জু॥ হয়ত কথা বলতে পারে না, বোবা।

[অশোক লোকটার পেটে একটা খোঁচা দিল। মুখ দিয়ে একটা গোঙানির মত শব্দ বেরুল। মুখে কাতরতা ফুটল। তারপর আবার নির্বিকার হ'ল মুখ।]

অশোক॥ লোকটা কানেও শুনতে পায় না। এখন কি করা যায় একে নিয়ে। ছেড়ে দিলে আবার গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াবে।

মঞ্জু॥ অসহ্য। একটা কাগজে ও কি চায় লিখে দেখাও ত। যদি পড়তে পারে, যদি লিখে দেয় !

[কমল পকেট থেকে পেন বের করে টেবিল থেকে একটা কাগজ নিয়ে লিখে ওর চোখের সামনে ধরতে হাত বাড়িয়ে দিল। মুখে সেই হাসি। সকলের দিকে রহস্যময় তাকাল। তারপর কলমটা নিয়ে নিচু হয়ে লিখতে লাগল। সকলে উৎসাহে কৌতুহলে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ক্রমশ মুখে উৎসাহহীন বিস্ময়। কাগজটা টেবিল থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল কমল।]

কমল॥ কি লিখেছে মাথা মুণ্ডু! এগুলো কোন অক্ষরই নয়, কতগুলো এলোমেলো দাগ। ভয়ংকর চালাকি রয়েছে লোকটির মধ্যে। একটা ঘোরেল লোক !

অশোক॥ যে কোন উপায়েই হোক লোকটাকে বুঝিয়ে দিতে হবে ও আমাদের শত্রু। ওকে আমরা শাস্তি দিতে চাই। ও যদি কোনরকম

কষ্টকর অত্যাচার এখান থেকে পেয়ে যায়, তাহলে চোখের কাছ থেকে ঠিক সরে পড়বে। কি ভাবে একে ভয় দেখান যায় ?

কমল ॥ একটা কাজ করা যাক। এর গলায় একটা দড়ি জড়িয়ে আমরা দুদিক থেকে আস্তে আস্তে টান দিতে থাকি। তারপর এক সময় ছেড়ে দেব।

অশোক ॥ দড়ি কোথায় ? ভাগ্যিস লোকটা কালা, ওর বিপদ ওর সামনে চেঁচিয়ে বলা হচ্ছে, বিন্দুমাত্র জানে না।

কমল ॥ এ লোকটা আমাদের তিনজনের শত্রু। কাজেই একে যখন অত্যাচার করা হবে আমাদের তিনজনকেই কিছু না কিছু ভাগ নিতে হবে। মঞ্জু তুমিও বাদ যাবে না। মঞ্জু ওর আঁচলটা আস্তে ওর গলায় পাক দিয়ে জড়াবে, যেন কৌতুক। তারপর দুদিক থেকে ধরে আমরা টান দেব।

মঞ্জু ॥ এ সব বিশ্রী ব্যাপারে আমি থাকব না। তোমরা যা খুশি কর।

কমল ॥ অর্থাৎ অপরাধটা আমাদের দিয়ে করাতে চাও। চলবে না, তোমাকেও যোগ দিতে হবে।

মঞ্জু ॥ কিন্তু আমি পারব না। ভাবতেই পারছি না। যদি মরে যায়।

কমল ॥ মরবে কেন ? তার আগেই আমরা ছেড়ে দেব।

মঞ্জু ॥ কিন্তু ভয় করছে আমার।

অশোক ॥ ভয় তাড়িয়ে তুমি লোকটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াও। ওর মাথায় চুলে আস্তে আস্তে হাত রাখ, দেখ কি রি-অ্যাকসন হয়, তারপর যেন তোমার একটা মজার খেলা এভাবে ওর গলায় আঁচলটা ঘুরিয়ে দাও। লোকটা বাধা দেবার আগেই আমরা দুদিক থেকে টেনে ধরব।

মঞ্জু ॥ কি রকম নিষ্ঠুর লাগছে ! এত বিশ্রী ব্যাপার এ সব।

কমল ॥ আমার অবাক লাগছে, ওর সামনে যে আলোচনা হচ্ছে তার

বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারছে না। লোকটা দেখছি আমাদের থেকেও অসহায়।

অশোক॥ কষ্ট যাও। আমরা ওর পিছনের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

[ওরা পিছনে চলে গেল। মঞ্জু লোকটির সামনে এসে বসল, তাকাল। লোকটি তেমনি নিঃশব্দে রহস্যময় হাসল। তারপর, খুব সন্তর্পণে নিজের হাতটা তুলে ওর একটা গাল ছুঁল। মঞ্জু ওর হাতটা ধরল, অমনি ভাবে আস্তে আস্তে পিছনে গেল। মাথায় হাত রাখল। লোকটা মাথাটা ঘোরাতে যেতেই, মঞ্জু সামনের দিক করে দিল। আঁচলটা ওর গলার উপর দিয়ে নিয়ে এল। একটা পাক দিল। ওরা দুজন দুদিক থেকে এসে ধরল। মঞ্জুর দিকে কমল, অপর প্রান্তে অশোক। ওরা টান দিল। ক্রমশ জোরে টানতে লাগল। লোকটার চোখ বড় হল, একটা শব্দ বেরুতে লাগল কষ্টের।]

মঞ্জু॥ ছেড়ে দাও এবার, ছেড়ে দাও।

[ওরা আর একটু জোরে টানল।]

মঞ্জু॥ কি করছ। ছেড়ে দাও মরে যাবে যে।

[ওদের মধ্যে যেন মেরে ফেলবার একটা নেশা জেগে উঠল। লোকটার মুখ হাঁ হয়ে গেল। চোখ লাল। মুখের সমস্ত শিরা ফুলে উঠল। দুহাতে কাপড়টা দুদিকে ধরে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। মঞ্জুকে অস্থির দেখাচ্ছে। ও কমলের হাত ধরে টানতে আরম্ভ করল।]

মঞ্জু॥ ছেড়ে দাও বলছি, ছেড়ে দাও। কি হচ্ছে, ছেড়ে দাও। মরে যাবে, ঠিক মরে যাবে।

[ওরা আরো জোরে টান দিল। যেন কিছুই কানে যাচ্ছে না। একসময় লোকটির কাঁধ ঢলে পড়ল, চোখ বন্ধ। চেয়ারের পিঠে ওর

মাথা হেলে রইল। ওরা ধরাধরি করে খাটে শুইয়ে দিল। মঞ্জু স্থির দাঁড়িয়ে রইল, ওর চোখে মর্মান্তিক ভয়।]

মঞ্জু ॥ কি হল!

কমল ॥ যা হবার। মারা গেছে।

মঞ্জু ॥ তার মানে তোমরা মেরে ফেলতে চাইছিলে? খুনি, তোমরা খুনি! তোমাদের দিকে তাকাতে ঘৃণা করছে আমার। তোমরা কি!

অশোক ॥ উত্তেজিত হয়ো না, আগে ভাব এটাকে সরিয়ে ফেলা যায় কি করে। মাথায় করে বাগানে নিয়ে যাই আসুন।

কমল ॥ আমি পারব না। মড়া শরীর ছুঁতে আমার ভয় করে। তাছাড়া ওর বাবা, কিংবা রামখিলন যদি জেগে ওঠে! বাগানের সামনেই রাস্তা, কেউ যদি দেখে ফেলে। বরঞ্চ এই জানলা দিয়ে নিচে ফেলে দিই।

মঞ্জু ॥ পড়ে যাবার শব্দ হবে না? তাছাড়া এই জানলাটা ছাড়া ওপর থেকে পড়বার আর কোন জায়গাই নেই। পুলিশ বুঝতে পারবে লোকটা যেকোন ভাবেই হক এ-ঘরে এসেছিল। এ-সব ঝামেলা কি ভয়ানক, জান?

অশোক ॥ একটা ব্যাপার ভাল লাগছে, এখন আর দুটো নজর রাখা চোখের ভয় নেই। বেশ স্বাধীন লাগছে।

কমল ॥ যেন যা খুশি করা যাবে। পথে যখন হাঁটছি বা কোথাও যাচ্ছি মনে হবে না নজরবন্দী হয়ে আছি। তোমার ভাল লাগছে না—জানলা দিয়ে আর কেউ সুযোগ পেলেই তোমার দিকে তাকাতে পারে না।

মঞ্জু ॥ কি আশ্চর্য, এসময় তোমাদের আনন্দ হচ্ছে, একটা মড়া চোখের সামনে! এত বিশ্রী লাগছে আমার। এত ভয় করছে!

অশোক ॥ মড়াটা ত আছেই। মুক্তির আনন্দটা ত কিছুকাল করে নাও।

তাছাড়া এই মরা শরীরটা তোমার গেস্ট, তোমার বাড়ির অতিথি, ভাবনাও তোমার। আমি কি করতে পারি।

মঞ্জু॥ আমার অতিথি মানে? তোমরা মেরে ফেলেছ। আমি মারতে চাইনি।

কমল॥ কিন্তু তোমার আঁচলের ফাঁসে মারা গেছে, মানো ত?

মঞ্জু॥ তার জন্য আমি দায়ী হব কেন? আমি তোমাদের অত জোরে টানতে বারবার নিষেধ করেছি।

অশোক॥ কিন্তু মনে মনে চাইছিলে, আপদ মরে গেলেই ভাল।

মঞ্জু॥ আমার মনের খবর আপনি নিশ্চয়ই আমার থেকে বেশি জানেন না।

অশোক॥ অনেক সময় জানি। লোকটা মরে গেছে দেখে যতটা ভয় পাবার কথা তুমি ত তা পাও নি। তাছাড়া এরকম মারাত্মক খেলায় কত সহজে তুমি যোগ দিয়েছিলে।

মঞ্জু॥ আপনার কোন কথা শুনতে চাই না আমি। কমল, কিছু একটা কর। একটা মড়া ঘরে রেখে আমি যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

কমল॥ বিশ্বাস কর মঞ্জু, কেমন নার্ভাস লাগছে। এরকম সিচুয়েশনে আমি পড়িনি কখনো। ব্যাপারটা কিভাবে ট্যাকল করা যায় আমি বুঝে উঠতে পারছি না। সব কিছু সমস্যার পিছনে (অশোককে দেখিয়ে) এই ভদ্রলোক। উনি এসেই গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছেন। আমরা দুজন মাত্র থাকলে কত আনন্দে কেটে যেত ভাব। এসব ঝামেলাই হোতনা। ঐলোকটাকে কে ডাকলো—উনিইতো। আমরা কোন দিনতো ডাকিনি।

মঞ্জু॥ (অশোককে) আপনিই আসলে দায়ী। আপনাকেই ভাবতে হবে কি করা যায়। সব দায়িত্ব আপনার।

অশোক॥ দায়িত্ব থাকতে পারে। কিন্তু আমি ত ওটাকে তোমাদের প্রেজেন্ট করেছি। তোমরা দুজনে ওটাকে কোথাও লুকিয়ে রাখবে, মধ্যে মধ্যে

পচে ওঠা দুর্গন্ধে সকলের আড়ালে দমবন্ধ করে থাকবে, কখনো কেউ দেখে ফেলার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবে। বেশ লাগছে আমার। নিষ্ঠুরতা এত ভাল নেশা!

মঞ্জু॥ মড়াটার কোন বন্দোবস্ত আপনাকেই করতে হবে। ছাড়ব না আপনাকে।

অশোক॥ আমাকে শাসিয়ে কি লাভ। তোমার অন্য কোন ব্যাপারে প্রয়োজন হল না, মড়া ফেলতে ডোম হতে যাব কেন? যেরকম হঠাৎ এসেছিলাম, এক্ষুনি তেমনি চলে যাচ্ছি—

[উঠল অশোক।]

হ্যাঁ, (মঞ্জুকে) বাইরে একটা বাক্সে তোমার কিশোর বয়সের মনটা রয়েছে, ওটা অবশ্য আমি নিয়ে যাচ্ছি। চলি। নমস্কার।

কমল॥ থামুন, যেতে পারবেন না আপনি। আমাদের বিপদে রেখে নিজে দায়মুক্ত চলে যাবেন, মানে? আপনাকেই থাকতে হবে, একসঙ্গে সব বিপদ ভাগ করে নিতে হবে।

অশোক॥ রাজি আছি। তবে একটা সর্তে। বিপদ কেটে গেলে মঞ্জুকেও আমাদের দুজনের মধ্যে সমান ভাগ করে নিতে বাধা দেবেন না, বলুন।

কমল॥ কোন মানে হয় না আপনার কথার।

অশোক॥ মানে হয় না বলেই, আমি চলে যাব।

মঞ্জু॥ আপনাকে থাকতে হবে, তিনজনে মিলে কোন উপায় বের করতে হবে। আপনি থাকুন। (অসহায়ভাবে) আপনি থাকুন না।

কমল॥ আপনাকে এত সহজে আমি যেতে দেব না।

অশোক॥ আমি থাকলে, অলসের মত বসে থাকব। নানারকম দাবি করব, মঞ্জু রাজী হবে না, আপনিও না। আপনারা আমি চলে যেতে বাধা দিলে আপনাদেরই অসুবিধে, আমি চেঁচাব। গোলমালে পৃথিবীর লোক জেগে উঠবে।

[অশোক দরজার কাছে গেল।]

মঞ্জু॥ সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছেন? আমার ভয় করছে কিন্তু, শুনছেন, আমার ভয় করছে, আপনি থাকুন না।

কমল॥ আমরা দুজনে মড়াটা নিয়ে কি অসহায়, বুঝছেন না।

অশোক॥ বুঝেও কোন লাভ নেই আমার। আমার চলে যাওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, পৃথিবীতে প্রথম শ্মশানের মধ্যে আমি একটা ফোন রাখার ঘর তৈরী করছি। যাতে মৃত্যুর পরেও ফোন করা যায়। কি ভিড় হবে আমার ফোন ঘরে। আচ্ছা, নমস্কার। চলি। আসা আর যাওয়াটা যদি মসৃণ রাখতে পারতাম। বোধ হয় মসৃণভাবেই যাচ্ছি।

[অশোক চলে গেল।]

কমল॥ লোকটি নিজে ত বেমালুম কেটে পড়ল। কিন্তু আমি কি করব। আসলে তুমিই সব কিছুর জন্য দায়ী। যদি এরকম একটা কিম্ভূত খেলা শুরু না করতে কোন গণ্ডগোলই হত না, আমরা যেমন ছিলাম তেমনি থাকতাম।

মঞ্জু॥ কিন্তু কোন অপরাধ ত আমি করতে চাইনি! আমি তোমাদের কাউকে কখন বিপদে ফেলতে চাইনি। যখন যা হয়ে গেছে, আমার অনিচ্ছায় হয়েছে, বিশ্বাস কর।

কমল॥ বিশ্বাস অবিশ্বাসে আর যাই হক মড়াটা সরানোর কোন উপায় হবে না। এ মড়াটার সব দায়িত্ব তোমার, তোমারই ভেবে পথ বের করা উচিত। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার অদ্ভুত খেলাই এ সবের মূল।

মঞ্জু॥ কিন্তু আমি একা কি করব? কি পারি আমি?

কমল ॥ আমিই বা পারব ভাবছ কি করে ?

মঞ্জু ॥ কিন্তু তুমি ছাড়া এখন কে করবে ?

কমল ॥ আশ্চর্য, সকলের তৈরী একটা বিপদ আমাকে কাঁধে করে টানবার ভার চাপাচ্ছ, অদ্ভুত অনুরোধ ত তোমার।

মঞ্জু ॥ সকলের বলছ কেন ? এখন সমস্যাটা কেবল তোমার আর আমার। দুজনে মিলে আমাদের বাঁচতে হবে।

কমল ॥ আমি মড়া বয়ে নিচে নামতে পারব না। অসম্ভব। সোজা কথা।

মঞ্জু ॥ কি হবে তাহলে ? ভোর হয়ে যাবে, লোকজন আসবে !

কমল ॥ কি হবে আমি জানি না। তোমাদের এতবড় বাড়ি আছে, কোথাও লুকিয়ে রাখ। কোন একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখ। রোজ রাত্তিরে বাগানের মাটি একটু একটু করে খুঁড়ে একদিন পুঁতে ফেলবে।

মঞ্জু ॥ সকলের চোখে পড়বে না ব্যাপারটা ? তাছাড়া বাবার কাছে কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না। তুমি বুঝতে পারছ না !

কমল ॥ তাহলে কি করব আমি। নিজেকেও গলায় দড়ি দিয়ে বাঁচানো ছাড়া কোন পথ দেখছি না।

মঞ্জু ॥ (গম্ভীরভাবে) তুমি সহানুভূতি দিয়ে আমাকে ভাবছ না। নিজের ভয়ে উত্তেজিত হচ্ছ। নিজের অসহায়তার কথা ভাবছ, আমাকে ভাবছ না। এরকম একটা সংকটে পড়ে ভালই হল কমল, আমাদের দুজনের মধ্যের ফাঁকটার দূরত্ব কতখানি, আমার মেপে নেবার হয়ত দরকার ছিল।

কমল ॥ তুমিও ত আমাকে সহানুভূতি দিয়ে ভাবছ না। যা আমার সাধ্যের বাইরে, তাই করতে বলছ আমাকে। সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

মঞ্জু ॥ যখন সম্ভব নয় তুমি যেতে পার। যা করবার আমিই করব।

কমল ॥ এ তোমার রাগের কথা।

মঞ্জু ॥ রাগের কথাও নয়, অনুরাগের কথাও নয়। যাবে বলছিলে, বরঞ্চ তুমি যাও এখন।

কমল ॥ মঞ্জু, আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারলুম না।

মঞ্জু ॥ আমার বোঝার দোষ।

কমল ॥ তুমি আমাকে বুঝতে চাইছনা।

মঞ্জু ॥ আমার অনেক দোষ আমি জানি।

[ভিতর থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠল।]

টমিটা ডাকছে, বোধহয় বাবা জেগে উঠেছে। দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? নিশ্চয়ই আমার উদ্ধারের কথা নয়।

কমল ॥ ভাবছি, তোমাকে অসহায়ের মতো ফেলে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমাকেও কম অসহায়ের মতো যেতে হচ্ছে না। আমি ঠিক তোমার কতখানি যোগ্য নিজের কাছে বুঝে নেবার দরকার আছে।

[টমিটা আবার ডেকে ওঠে]

মঞ্জু ॥ বাবা এক্ষুনি এসে পড়বে। তুমি যাও।

কমল ॥ হয়ত অপরাধীর মতোই যাচ্ছি। প্রয়োজনে দণ্ড পেতে হলে, মেনে নেব। চলি।

[কমল চলে যায়। মঞ্জু একা স্থির বসে থাকে। মুখে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।]

মাইক্রোফোন ॥ মঞ্জু, এবার তুমি একা। আয়নাটার কাছে যাও। তোমার সেই ছায়াটা, দেখো, এখনো হাসছে—ওর খেলাটায় ও কিন্তু এক বিন্দুও ভয় পাচ্ছে না। মঞ্জু, তুমি পাহারাওয়ালাটার দিকে তাকাও। ও এক্ষুনি জেগে উঠবে। পাহারাওয়ালাটাকে মেরে ফেলা ভীষণ শক্ত। ঐ ভাখো, ও উঠছে [পাহারাওয়ালা ধীরে ধীরে ওঠে, দরজার দিকে হেঁটে যেতে থাকে] ওর অনেক কাজ। ছুটো প্রখর চোখ মেলে

ওকে বহুকাল তাকিয়ে থাকতে হবে—ওকে মেরে ফেলা ভীষণ শক্ত।
[পাহারাওয়ালা বাইরে চলে যায়।] মঞ্জু, আয়নাটার কাছে যাও, তোমার ছায়াটাকে আয়নার ভিতর থেকে নিজের মধ্যে তুলে নাও।
[মঞ্জু আয়নার কাছে যায়, তাকায়] অনেক রাত হোল। বাইরের দরজা দিয়ে যারা যারা এসেছিল, সকলেই আজকের মতো ফিরে গেল। তুমি দর্শকের মতো অনেক কিছু দেখলে, তাইনা? দেখাটাইতো জীবন, বেঁচে থাকার সাহস। অনেক রাত হোল। আয়নায় তোমার ছায়াটার খেলা আজকের মতো ফুরোলো—ওকে বুকের মধ্যে তুলে নাও।
[মঞ্জু আয়নার প্রতিবিম্বের দিকে প্রসন্ন মুখে হাতে বাড়িয়ে দেয়। পর্দা নেমে আসে।]

এই সব স্বগতোক্তি

স্বর্যজ্ঞানে সমুজ্জ্বল নাটক

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত

[এই নাটিকার অভিনয় নাট্যকারের অনুমতি সাপেক্ষ]

চরিত্রলিপি

অন্যতমা। প্রথম নায়ক। দ্বিতীয় নায়ক তৃতীয় নায়ক। চতুর্থ নায়ক। পঞ্চম নায়ক

ও

সংশপ্তক একতান সমূহ।

আলোকিত শূন্য মঞ্চ। মঞ্চের উপর অর্ধবৃত্তাকারেঘেরা কয়েকটি উচ্চস্থান। অল্পক্ষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে আলোকিত থাকার পর অন্ধকার হইয়া আসে। সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া যাওয়ার পর মুহূর্তেই আলো আসিয়া পড়ে বামদিকের সম্মুখস্থ উচ্চস্থানটির উপর। সেই আলোর উচ্চস্থানের উপর প্রথম নায়ককে দেখা যায়।

প্রথম নায়ক

খোলা রাস্তায় শিকে ঝোলান খণ্ড খণ্ড মাংস খণ্ড,
চাটের আয়োজনও সম্পূর্ণ।
আমি কিন্তু গন্ধেই মাতাল।
সামনের ঐ পথ ধ'রে আমি এখানে এসে পৌঁছেছি।
এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না,
কিন্তু ঐ ওদিকে মোড় বেঁকলেই দেখা যাবে—
পথের দু'ধারে তোলা উনুনের সার।
আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী

এঁকে বেঁকে পাকিয়ে পাকিয়ে আমারই পিছন পিছন
এসেছিল
নিঃশ্বাস-আটকে-আসা ধোঁয়া।
চোখ জ্বলে যায়,
কালো-অতীত ধরে থাকে অন্ধকার ভবিষ্যৎ এক—
তবু কিন্তু জ্বলে,
চোখ কিন্তু কোথায় যেন ওঠে জ্ব'লে জ্ব'লে।
বিস্রস্ত বেশ-বাস, এলোমেলো চুল,
ঠিক যেন……ঠিক যেন……

[অন্ধকার ওকে ঢেকে দেয়। নিচে বিপরীত দিক হইতে অন্তমাকে আসিতে দেখা যায়। বামপার্শ্বের কাছাকাছি আসিয়া থামিয়া যায়। তারপর—]

অন্তমা

কাল আমার কাছে খদ্দের এসেছিল রাতে, অনেক রাতে,
রাত তখন দুটো হবে—
না, ঠিক বলতে পারি না,
হয়তো রাত তখন গভীর,
আমার অন্ধকারের মতই গভীর,
গভীর, কিন্তু রঙ তার ঘন-কালো নয়।
কেমন যেন ধোঁয়াটে…
ঐ যে ধোঁয়া, যা এইমাত্র ফেলে এলাম
ঐ তোলা-উনুনের সার—
ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আঁকাবাঁকা, পাকানো-পাকানো,
আমারই পিছন পিছন এসে আমাকে কেমন যেন
আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল

আহ্—কি নরম তার আলিঙ্গন,
ঘন কুয়াশায় ঢাকা নরম সকাল,
পচা-পুকুরে-পুকুরে ঘাটে-ঘাটে জমা
ঘন কালো সবুজ শৈবাল—
ঠিক যেন……ঠিক যেন……

[অন্যতমা অন্ধকার হ'য়ে যায়। প্রথম নায়ক আলোয় আসে।]

প্রথম নায়ক

ঠিক যেন আমার সকাল,
কোন দূর শৈশবের কোন এক সুদূর সকাল,
কোন এক সুদূর দিগন্ত।
অতীতের মৃত জলরাশি
তুলে ধরে সে দিগন্ত সোনা-মোড়া সাম্রাজ্যরেখায়।
সেই-সে সকালের নির্বাসিত আমি,
আমার দামামা,
সহজ আলস্যে উঠেছিল জেগে অনন্তের সীমান্তরেখায়।
জেগে দেখি—
মৃত জলরাশি ঢেকে ফেলে সোনামোড়া সাম্রাজ্যের ছবি,
জল-ডাঙা এক হ'য়ে যায়।
পচা মাটি,
তীরভূমি ফুলে কেঁপে ওঠে।
বুড়ো বুড়ো পচা পচা গাছ,
কাঁকড়ার উচ্ছিষ্ট যত,
রস সব নিঃশেষে বিলীন,—
তবু কিন্তু পিঁপড়ের সার ঘোরে চারপাশে।
পাতা নেই, ছোট গাছ, রুক্ষ ডালপালা,

ছোট ছোট পথে যেন ছুটে ছুটে যায়—
পচা-পচা, বুড়ো বুড়ো এলোমেলো,
টাকপড়া রুক্ষ জটাজাল।
বিস্রস্ত কৌপীন, যক্ষারোগী মহাকাল,
থক্‌-থক্‌ ক্ষয়রোগ ক্ষয়ে যায় রোগী বিভীষণ।
[প্রথম নায়ক অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। অন্যতমা আলোর আসে।]

অন্যতমা

ঠিক যেন আমার সকাল।
অনেক দিন আগে, সেই সকালে আমার ঘুম ভাঙত।
ধোঁয়া-ধোঁয়া ঝাব্‌-ঝাব্‌ কুয়াশায় ঘেরা,
ছেঁড়া-ছেঁড়া শাড়ি-ছেঁড়া পাড়,
মা-বাপ, ভাই-বোন একসাথে শুয়ে,
বাসা নয় খোঁয়াড় খোঁয়াড়।
পাড়ে-ঝোলা কালকের ব্লাউজ,
হাতার খাঁজেতে চলে পিঁপড়ের সার,
বাৎসল্যের রসে ভেজা যৌন গন্ধে ভরা,
বাসা নয় খোঁয়াড় খোঁয়াড়।
[অন্যতমা সামনের শূন্যতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কী যেন চিন্তা করে। প্রথম নায়ক আলোয় আসে, ঐ উচ্চস্থানের উপর। এখন আলোর মধ্যে দুজনেরই উপস্থিতি, কিন্তু দুজনের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই।

প্রথম নায়ক

ঠিক যেন কাল রাতের সেই রাস্তা,
বীভৎস ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত একটা সাপ,
এঁকে বেঁকে ম'রে প'ড়ে আছে

দুধারেতে আঁস্তাকুড়, আশপাশ ক'রে ক'রে আসা
কিন্তু ভাজা-পেঁয়াজের কড়া গন্ধে,
নিবনিব গ্যাসের আলোয়,
ঝোলান-চীনে লণ্ঠনে আর রূপোমোড়া খিলিপানে,
তবু কিন্তু কেমন রঙিন।
তেল-তেল ছোপ-ধরা, সিল্কের শাড়ি-পরা মেয়েদের সার,
রঙমাখা খড়ি ঘসা স্থবিরা নগরী
জরাজীর্ণ যৌনতার উচ্ছিষ্ট-পসরা রেখেছে সাজায়ে,
আমি কিন্তু তার মাঝে নিঃসঙ্গ একাকী।
যেমন একাকী ছিলাম দুপুরের শহরের মাঝে
লক্ষ লক্ষ হাত,
জীর্ণ-শীর্ণ—তবু যেন ধারাল ইস্পাত,
শুধু দাবি করে, শুধু চাই চাই রব,
মিছিলে মিছিল, ক্ষিপ্ত যেন নগর প্রান্তর,
আমি কিন্তু তার মাঝে নিঃসঙ্গ একাকী।
সোনামোড়া সাম্রাজ্যের মমি, অতীতের
নেশা-লাগা মৃত-অন্ধকার,
বারে বারে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, সামান্য-ক্ষণের
এই আসা-যাওয়ার কাজ কি উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে! সেই তো সেই
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান, আমিকে হারিয়ে!
তার চেয়ে নিজেকে নিরাপদ রেখে
মূল্য দিয়ে কিনে নেব
নিজস্ব আহ্লাদ। বিবরে আশ্রিত হব।
এঁকাবেঁকা ঐ রাস্তায়
আঁকাবাঁকা নারীদেহরেখায় খুঁজে নেব আমার বিবর।

আমার খুঁজে নেওয়া কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে গেছে,
রাতের পর রাত আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেছে,
যৌনগন্ধে মাতাল-হওয়া আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেছে,
বারে বারে আমি সেই নিঃসঙ্গ-একাকী।
ঠিক যেমন একাকী সেই লোকটা
সারাদিন খেটে-খাওয়া ক্লান্তির পর,
কোন এক পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে,
বাহু দিয়ে বেষ্টন করা ঠ্যাং দুটো উঁচু ক'রে তুলে,
মাথা গুঁজে দিয়ে নিঃশব্দ চিন্তায় মনে আনে
কোন এক মিছিলের কথা,
কিন্তু খেটে-খাওয়া বাহুমূলের বিবরে
কোন কালচার নেই, কোন
যৌন গন্ধ নেই—
সেখানে শুধু অম্লগন্ধ-স্বেদের আঘ্রান,
ইন্‌কিলাব-জিন্দাবাদে দিগন্ত মুখর।
আমার ফ্রয়েডীয় বিবরে কিন্তু কালচার আছে
তবু কেন রাতের পর রাত আমি ব্যর্থ হ'য়ে ফিরেছি?
আমি মুদ্রামূল্য দিয়ে আহ্লাদ কিনতে গিয়েছি,
কেবলি কেন মনে হয়েছে আমি একটা
আহ্লাদ-বিক্রী করা মেয়ে,
সারারাত আহ্লাদ বিক্রী ক'রে ঘাম-গন্ধ-শয্যায় ফিরেছি,
নিজেকে টানতে টানতে

[মুষ্টিবদ্ধ দুইহাত কপালের উপর রাখে]

অন্ততমা

একদিন ধোঁয়াঘেরা সন্ধ্যায় আমি

আমার খোঁয়াড়ের দরজায়

দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একটা বখা-ছেলে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলাম। ছেলেটি প্যাণ্টের দুপকেটে হাত ঢুকিয়ে শিষ দিতে দিতে যাচ্ছে, আমি তার পিছন পিছন চলেছি। দুপাশের বাড়ি ঘর যেন স'রে স'রে পথ ক'রে দিচ্ছে—যেন গল্পে শোনা লক্ষ্মীমন্ত সেই মেয়ে সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, দুপাশের ঢেউয়ের পাহাড় পদ্মের পাপড়ির মত হ'য়ে স'রে স'রে যাচ্ছে।

তারপর কোনো একদিন, সকালের কুয়াশা যখন রক্তমাখা ঘায়ের মতন, পাশের কোন এক বাড়ি থেকে একটি মেয়ে মাতালের মত টলতে টলতে বেরিয়ে এল।

সেদিন সে আমাকে ভালবাসার কথা বললে।

বললে তোমাকে আমি মূল্য ধ'রে দেব, তুমি আমাকে আহ্লাদ বিক্রী করবে।

তারপর আমি এক আহ্লাদ-বিক্রী করা মেয়ে! সারারাত আহ্লাদ বিক্রী করার পর খদ্দের বিদায় ক'রে ঘাম-গন্ধ-শয্যায় ফিরি নিজেকে টানতে টানতে।

[মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত কপালের উপর রাখে। প্রথম নায়ক ও অন্যতমা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।]

[আলো আসে। পিছনের পটের মধ্যস্থলের সম্মুখবর্তী উচ্চস্থানের উপর দ্বিতীয় নায়ক।]

দ্বিতীয় নায়ক

আমার আকাশ কিন্তু হ্রেষায় মুখর।
হয়-বাহিত সৈনিক কিন্তু নয়,
তারা সব রেসের ঘোড়া।

আমি যখন আমার শৈশব থেকে
বড় হওয়ার পথে পা দিয়েছি,
তখন থেকেই আমি ওদের ভালবাসতাম—বিশেষ ক'রে
একটিকে—আস্তাবলে রাখা আমাদের রেসের ঘোড়া।
যে তার সাদা-সোনালী কেশরের তলা দিয়ে সোজা
আমার দিকে তাকাত।
সৌন্দর্যে অপরূপ—
জীবন্ত দুটি নাসারন্ধ্র, ফুলে-ফুলে-ওঠা জীবন্ত দুই
অক্ষিকোটর।
দৌড়ে আসার পর স্বেদাক্ত-কলেবরে সে উজ্জল হ'য়ে উঠত,
আমি তখন আমার শৈশবের জানু দিয়ে তার ঐ থর-থর-
কম্পিত দেহের দুপাশ দুখানি চন্দ্রমায়
আবৃত ক'রে দিতাম।
কখনো কখনো আপন শক্তির প্রশংসায়—
পেশল গ্রীবায় তার নীল-শিরাজাল—
ফেনাভরা মুখ, নাসারন্ধ্রে উষ্ণশ্বাস,
মুখে তার ড্রাগন-আগুন—
সে তার মাথা উঁচু ক'রে তার ধৃষ্টতা ভরা আঁখির দৃষ্টি তার
ঈশ্বরের দিকে নিবদ্ধ করত।
তাই তো আমার আকাশ হ্রেষায় মুখর,
তাই তো আমার শৈশব থেকে
আমি ওদেরই ভালবাসতাম।
অহংকারের প্রবাহে রক্তিম আমার সেই স্বর্ণশিখর-প্রাঙ্গণ।
দুই মহাদেশ-ধৃত সংকীর্ণ সমুদ্র খণ্ড,
আমার গোপন পাপে সামুদ্রিক কূর্ম যত চলাফেরা করে,
আমার স্বপ্নের পথে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর সহস্র শৈশব।

সুদূর শৈশব, আমি আজ বিধাতার মতই প্রবল,
তার মতই বিকারগ্রস্ত, আসক্ত মানুষ এক, নীরব নিস্তব্ধ।
শুধু সুদৃশ্য বঙ্কিম ভ্রূ, বিলাসেতে তার হাসির বিভ্রম,
শান্ত ডানা মেলে দিয়ে আকাশে উড্ডীন,
ত্রুটিহীন তার সেই আকাশেতে ফেরা।
অন্তহীন অগ্নিদাহ, জাগ্রত ক্রেটার,
ঈশ্বরের মতই লুব্ধ, জিহোবার মতই প্রতিহিংসাপরায়ণ,
তবু কিন্তু স্তব্ধতার আবরণে ঢাকা, আঁখির পল্লব যেন
নিবাত-নিষ্কম্প,
সেই স্তব্ধতার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে,
সমুদ্রের প্রবঞ্চক পথে,
বারে বারে ফিরে আসা আমার আকাশে,
দৃশ্যমান পৃথিবীর মাঝে।
আমেন, আমেন, হে আমার স্বর্গস্থ পিতা,
তোমার প্রেরিত-পুত্রেরা সব দিয়ে গেছে দ্বীপের আশ্বাস,
আমি ঠিক তাদেরই মতন।
হিংসার ক্লীবত্বে আর ক্রোধের তুষারে,
ঐ সব পরমহংসের দল,
বিভ্রান্তির অলস মায়ায়
তুলে ধরে শ্বেতদ্বীপ, সুমেরুর ঊর্ধ্বে অবস্থান ;
তারপর লাল-ফুল সাদা ক'রে ক'রে
ফিরে যায় তোমারই আশ্রয়ে।
আমেন, আমেন !
হে বিধাতা, হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,
আমি ঠিক ওদেরই মতন।

[অন্ধকার দ্বিতীয় নায়ককে আবৃত করে। আলো আসে। উচ্চস্থানের পাশে অন্যতমা।]

অন্যতমা

সেদিন রাতে খদ্দের এসেছিল আমার কাছে,
গেরুয়ায় লম্বিত এক খদ্দের,
তার পরিচ্ছদে আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম,
উত্তরে সে বললে—
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি—
হে ভামিনী—অতি প্রত্যূষে জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে
নববস্ত্র পরিধানে তোমার গৃহ পরিত্যাগ করব।
মুদ্রামূল্য দিয়ে বিদায় নেবার সময় সে আমাকে বললে—
ঈশ্বরকে অনুসন্ধান ক'রো—
আমি যেমন সেই অনির্বাণ অব্যক্তের সন্ধানে এসে
তোমার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেলাম—
তুমিও তেমনি ঈশ্বর-সন্ধানে ব্যাপৃত থেকে প্রতি
রাত্রে আমার মধ্যে নিজেকেই খুঁজে পাবে।
আমি কিন্তু সেই লম্বিত গেরুয়ার মধ্যে ঈশ্বরকে পাই নি।
তারাভরা ছায়াপথে ঈশ্বর-সন্ধান করতে অন্ধকার
রাতের দিকে এগিয়ে এসেছি।
মাঝে মাঝে সঙ্গী ছিল দুটো অন্ধ কুকুর,
পথ হারালে তারাই মাঝে মাঝে পথ দেখিয়েছে।
অন্ধকারে এই চলা-ফেরা,
এর মাঝে আমি কিন্তু মাটির কোন সাদৃশ্য অনুভব করিনি
শুধু এক লবণ-আঘ্রাণ বারে বারে ওষ্ঠাধর

স্পর্শ ক'রে গেছে।
আর কানে আসছে এক কণ্ঠস্বর, বিরাম-বিহীন,
শুনছি, সে আমার মাথার ভিতর চলাফেরা করছে,
ঠিক যেমন মানুষের-মত-কথা বলা এক পাখী
খাঁচার ভিতর চলাফেরা করে।
অতি তুচ্ছ দৈনন্দিন আমার হৃদয়,
উর্বশীর ভালবাসা বিস্মৃত অতীত,
আমার উষার আলো কালো অন্ধকার।
রাতের আকাশের ব্যাপ্তিতে আমি চেয়েছিলাম আমার
বাসনা যেন চরিতার্থ হয়, আমি যেন ফুলের মত
বিকশিত হ'য়ে উঠি ;
কিন্তু রাত্রির তুষার, আর
শয্যাগত গান্ধর্বী-ভাবনা অম্লগন্ধে ভরা
পঙ্গু ক'রে দিয়ে গেছে সে-ব্যাপ্তি আমার।
তাই তো ঈশ্বর-সন্ধানে পথ চিনে চিনে
এই তারা-ভরা ছায়াপথে এসে থেমেছি ; কিন্তু আজও
পর্যন্ত সীমার মাঝে অসীমের কোন পদচিহ্ন আমি পাইনি।
[অন্ধকার অন্যতমাকে আবৃত করে। আলো আসে দ্বিতীয় নায়কের উপর।]

দ্বিতীয় নায়ক

তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল,
আমার এ পৃথিবীতে শান্ত জলরাশি
সকালের শূন্যতায় প্রশান্ত, স্থির, সাদা যেন দুধের মতন।
ক্রোধান্বিত ঈশ্বরের আদেশে আমি আমার নিজস্ব
অর্ণবপোত নির্মাণ করেছি।

আকাশের উর্বশী-মুহূর্ত তখনো অতিক্রান্ত হয় নি
আমি আমার জলরাশি দিয়ে সমস্ত পাটাতন
পরিচ্ছন্ন করেছি।
আকাশ তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে আমার
ঐ ক্ষুদ্র পরিসর পাটাতনে
এসে আবদ্ধ হয়েছে।
আমার সকাল আর দিনের শৈশব
গত রাত্রির চন্দ্রাতপের মধ্যে
পথ ক'রে নিয়ে নিরাকার-ঈশ্বরের মতই প্রসন্ন
আমার মুক্তচিত্তকে বিধৃত করেছে।
আমি ঈশ্বরের মতই মুক্তচিত্ত, আমার সঙ্গীত ভাবনা
ঈশ্বরের মতই স্বাধীন।
নীচের ঐ মহাজনারণ্য কোলাহলে কলহে মলিন,
আমি কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের মতই অনন্ত নির্জন,
আমেন, আমেন,
ঐ-সব দাবী দাওয়া ঐ-সব অতি ক্ষুদ্র-ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
ঐ-সব মালিন্যের বহু উর্ধ্বে,
আমার নিঃশব্দ-সত্তা ঐশ্বরিক নিস্তব্ধতায় বিরাজ করে,
আমেন, আমেন।
এ আমার নিজস্ব অর্ণবপোত,
নিজস্ব আমার এই সমুদ্রপথ।
ভাসমান বহু দ্রব্যরাজি,
কিছু তুচ্ছ, কিছু মৃত কিছু বা কৃত্রিম।
মন্থনের হলাহল ঐশ্বরিক উদারতায় আমি পান করেছি,
সুধাভাণ্ড করেছি গ্রহণ—আমেন, আমেন!

সহস্রাক্ষের ঐরাবত, সে আমার সে আমার !
ইন্দ্রাণীর স্বর্ণকিরীট, সে আমার সে আমার !
তবু কিন্তু মনে হয়—
সুরাপাত্রে রাখা সমুদ্রসুরার ভাসমান এই অর্ণবপোতকে
মাঝে মাঝে মৃত কাষ্ঠখণ্ড বলেই মনে হয়।
মৃত এক কাষ্ঠখণ্ডমাত্র, আর কিছু নয়। তবুও
আমেন, আমেন।

[দ্বিতীয় নায়ক সামনের শূন্যতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কি যেন চিন্তা করে। আলোর পরিধি বিস্তৃত হয়। সেই বিস্তৃত পরিধির মধ্যে উচ্চস্থানের সম্মুখে ভূমির উপর অন্যতমাকে দেখা যায়। দুজনের প্রত্যেকেই কিন্তু পৃথক, স্বতন্ত্র।]

অন্যতমা

আমি কিন্তু অন্য এক পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে কোনো
একদিনের হারিয়ে যাওয়া একটি মেয়েকে
খুঁজে পেয়েছিলাম।
জলে ভেসে-যাওয়া ভাসমান এক মৃতদেহ—
চারপাশে লোকজন, তাদের চোখে-মুখে বিপন্ন সংশয়—
মেয়েটির মুখে কিন্তু মৃদু-হাসির বিষণ্ণ প্রলেপ।
ওরই মধ্যে কে যেন বলে উঠল—
আরে, ওকে আমি একটু চিনতাম—মাঝে মাঝে
রাত-বিরেতে ওর ঘরে আমি যেতাম—
মন্দ ছিল না রে মেয়েটা!
চারপাশে অন্য লোকজন—
তাদের চোখে-মুখে কিন্তু বিপন্ন সংশয়—
মাঝখানে—যেন পুতুলের কাচঘরে ঢাকা—

জলে-ভাসা মেয়েটার চেহারায় যেন
মৃদু হাসির বিষণ্ণ প্রলেপ।
আবার আমি যখন ঈশ্বরের পদচিহ্নের সন্ধানে বার
হলাম, কোন একজনের কথা আবার আমার
কানে এল—আরে, ওকে আমি একটু একটু চিনতাম
—মাঝে মাঝে রাত-বিরেতে ওর ঘরে আমি যেতাম
—মন্দ ছিল না রে মেয়েটা!

দ্বিতীয় নায়ক

আমার এ অর্ণবপোত,
অতীতের সমুদ্রসুরায়
মাঝে মাঝে মৃত-কাষ্ঠখণ্ডের মত প্রতিবিম্বিত হয়।
তখন আমি ঈশ্বরের মত বিষণ্ণ হ'য়ে উঠি
জলে-ভেসে-যাওয়া শবদেহ ঐ মেয়েটাকে মনে পড়ে
ওকে আমি যেন একটু একটু চিনতাম,
মাঝে মাঝে রাত-বিরেতে ওর ঘরে আমি যেতাম,
মন্দ ছিল না কিন্তু মেয়েটা।
হে আমার স্বর্গস্থ পিতা,
তুমি ওর আত্মাকে স্বর্গস্থ কর
বারবনিতারা ধন্য হ'ক
কারণ তারা সহস্রের শয্যাসঙ্গিনী হয়—আমেন, আমেন।

[অন্ধকার দ্বিতীয় নায়ক ও অন্যতমাকে আবৃত ক'রে দেয়। আলো আসে। মঞ্চের দক্ষিণ কোণের নিকটবর্তী এক উচ্চস্থানের উপর তৃতীয় নায়ক।]

তৃতীয় নায়ক

মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনিতে মধ্যরাত্রি নিনাদিত।

বন্দিনী সীতাকে উদ্ধার ক'রে আমি আমার
আকাশযাত্রা আরম্ভ করেছি।
বেদগান, মন্ত্রোচ্চারণ, যজ্ঞ-আয়োজন,
মন্দিরেতে পূজাপাঠ, মসজিদে নমাজ,
গীর্জার প্রাঙ্গণে,
গীত হ'ল প্রার্থনা-সঙ্গীত,
কুরুক্ষেত্রে অশ্বথামা-হত-ইতি-গজে,
সত্যমেব-জয়তে ঝোলে সিংহের থাবায়।
আমি কিন্তু উর্দ্ধে আছি আকাশযাত্রায়।
সীতাকে পাইনি আমি,
সঙ্গে আছে কৃত্রিম-জানকী,
পশ্চিম সমুদ্র পথে স্বর্ণসীতা নিঃশেষে বিলীন।
আমার উজ্জ্বল নখরে মুক্ত নীলাকাশ
সূর্যশিখা গাঢ় হয় দিনের উত্তাপে।
নীচতে সমুদ্র-নীল,
লোকে বলে, নীল সমুদ্র নাকি লাল হ'য়ে যাবে।
কোর্ত্তার ল্যাপেলে আঁটা আরক্ত গোলাপ—
প্রভাতের শূন্যতায় যাত্রা শুরু ক'রে ; শেষ করি
গোধূলির আরক্ত রক্তিমে।
কৌরব দর্শক মাত্র,
সভাপর্বে উদভ্রান্ত সব পাণ্ডুর নন্দন,
মাতা গান্ধারীকে ধ'রে বস্ত্রহীনা করে।
কানীন গোত্রজ আমি জারজ সন্তান,
গোলাপের গন্ধ নিয়ে নাকে,
নিঃশব্দে সে বিবস্ত্রা-দৃশ্য উপভোগ করি

সত্যমেব-জয়তে ঝোলে বিশীর্ণ থাবায়—
সেটাকে দোলাতে দোলাতে,
শীর্ণ ঐ সিংহটা কিন্তু দন্তহীন হাসি হেসে যায়।
ক্ষুরধার কঠিন নির্মম আমার আনন্দ
প্রচণ্ড মহিষরূপ ধারণ ক'রে সিংহবাহিনীকে হত্যা করে ;
শীর্ণ ঐ সিংহটা কিন্তু দন্তহীন হাসি হেসে যায়,
'সত্যমেব-জয়তে' টাকে দোলাতে দোলাতে।
পয়োমুখে আমি ভাসমান,
প্রলয়-পয়োধি নীচে।
পচা-কাঠ নোয়াহ্‌র নৌকায় কিছু মানুষ
আর কিছু শান্তির পায়রা।
মাঝে মাঝে দু-একটা পায়রা আমার কাছ বরাবর ঘুরে
চারপাশের অবস্থা জেনে নিয়ে
নৌকায় ফিরে যায়।
নোয়াহ্‌ তখন আমার উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করে—
হে ভৈরব কর শান্তি পাঠ।
নিশ্চিন্ত আরামে আমার আকাশ-বিলাস।
কিন্তু আরো কিছু লোক আছে,
অশক্ত দুর্বল কিছু লোক,
মল-মূত্র-দুর্গন্ধে মলিন, ইতর র‍্যাব্‌ল্‌।
দুহাত উঁচু ক'রে তারা ভয় দেখায়—
একদিন তারা জোর ক'রে ঐ নৌকাটাকে কেড়ে নেবে।
আমি তাই নোয়াহ্‌কে একটু দূরে দূরেই থাকতে বলেছি।
নোয়াহ্‌ তাই একটু দূরে দূরেই থাকেন, আর মাঝে মাঝে
আমার কাছে শান্তির পায়রা পাঠান।

একলব্য-পক্ষপাতে নির্বাসিত দ্রোণগুরু,
ওরা বলে—ওরা নাকি দ্রোণশিষ্য দ্রোণের সন্তান,
সম্পূর্ণ-অঙ্গুষ্ঠ নিয়ে ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করে।
ওদের একজনের সঙ্গে একদিন আমার দেখা হয়েছিল।
হাপরের মত বুকের পাঁজর, যেন
হা-হা ক'রে শ্বসিছে হুতাশ।
বললাম—বুদ্ধের মত নির্বিকার হও, খ্রীষ্টের মত সহিষ্ণু হও,
আমার অশোকের মত সাম্রাজ্যে তুমি কলিঙ্গের মত
পরাভূত হও, জেনো—প্রভু তোমার মতই উলঙ্গের
ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন খড়ের শয্যায়।
শোন—আমি তোমাকে নোয়াহ্‌র নৌকায় আশ্রয় দেব।
সেখানে নৌকার পাটাতনের ধারে ব'সে মাঝে মাঝে
আমি তোমাকে রূপকথা শোনাব—
অমৃতময় নির্ঝরিনীর রূপকথা—
পাতালপুরীর ভোগবতী নদীর রূপকথা—
সেই রূপকথার নদীতে যখন নোয়াহ্‌র নৌকা
নীল সবুজ ছায়া ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাবে।
তখন তার দু'পাশ ঘেয়ে রূপোলি মাছের সার আমার
রূপকথার গানের দৈর্ঘ্যে লম্বিত হয়ে থাকবে
আর তোমার ভূলোক-দ্যুলোক মধুবাতা ঋতায়তে
মধুময় হয়ে উঠবে। সব কথা শুনে সে আমার প্রতি তার
ক্রোধান্বিত ধূর্জটি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।
সে-দৃষ্টি ঘৃণায় কঠিন। আমি কিন্তু বিচলিত হইনি।
বাসনায় বহ্নিমান ধূর্জটির ক্রোধ, আমি কুমারসম্ভবে
আশ্রয় নিলাম—

তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্‌গিরঃ খে মরুতাংচরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥

আমার নিপীড়িত-লোলুপতা ভস্মীভূত মদনরেণুতে
মধুময় হয়ে উঠল,
নিশ্চিন্ত আরামে আমার আকাশ বিলাস,
চক্রপানি আমার সহায়।

[তৃতীয় নায়ক অন্ধকারে আবৃত হয়। উচ্চস্থানের পাশে আলোর পরিধির মধ্যে অন্যতমা।]

অন্যতমা

সমাধিক্ষেত্রে আমি আমার ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছি।
শ্মশানেতে চিতা জ্বলে, সমাধির মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা পথ
বস্ত্রাবৃত শব আর চিতা বহ্নিমান,
আমার প্রশ্নের তারা দিয়েছে উত্তর।
পর পর দুই মহাযুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি এই
সমাধি ক্ষেত্র আশ্রয় করেছেন।
স্বেদাক্ত ঘামঝরা খেটে খাওয়া মানুষের অসঙ্গত দাবীর
উত্তরে তিনি মৌন অবলম্বন ক'রে এই চিতায়
আশ্রিত হয়েছেন।
আমার ঈশ্বর, সে তো মৃতের ঈশ্বর।
কুলবৃদ্ধ নোয়াহ্‌র জাহাজ থেকে নির্বাসিত ঐ
মানুষগুলোর প্রশ্নে উত্যক্ত হ'য়ে তাঁর স্বজন বান্ধবেরা তাঁকেই
শরাঘাত করেছে।
দ্বারকাপতি কৃষ্ণের মত কুপিত হয়ে তিনি

কিন্তু ঐ নির্বাসিতদেরই
অভিশাপ দিয়েছিলেন—বলেছিলেন—আমি অব্যক্ত,
কিন্তু তোমরা আমার যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করেছ।—আমি
অভিশাপ দিচ্ছি, তোমাদের কোনদিন মৃত্যু হবে না!
অভিশপ্তেরা অশ্লীল হ'য়ে বলেছিল—
হে বরাহনন্দন—আমরা জানি আমাদের
কোনদিন মৃত্যু হবে না, তুমি কিন্তু মৃতের ঈশ্বর!
তিনি যখন ক্রস বহন ক'রে নির্বাসিত ঐ নোংরা কালো
আর পীত লোকগুলোর কাছে গিয়েছিলেন, তারা
তখন তাঁকে নোয়াহ্‌র জাহাজে দূর করে দিয়েছিল।
বলেছিল—
আমরা জানি—দরিদ্র আমরা আশীর্বাদপূত,
স্বর্গরাজ্য আমাদেরই,
তাই মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্যে আমরা তোমার দেখাশুনা করব।
তুমি আমাদের মর্তভূমি থেকে কুলবৃদ্ধ ঐ নোয়াহ্‌র জাহাজে
দূর হ'য়ে যাও।
ক্ষুব্ধ সেই সূত্রধারপুত্র স্বর্গস্থ পিতাকে এদের
ক্ষমা করতে বলেছিলেন।
পিতা—তুমি এদের ক্ষমা কর।
—আমি কিন্তু এদের অভিশাপ দিচ্ছি—এদের কোনদিন
মৃত্যু হবে না!
তাই তো সমাধি ক্ষেত্রে আমি তাঁর সন্ধান পেয়েছি,
আমার ঈশ্বর আজ মৃতের ঈশ্বর।

[আলোর পরিধি উচ্চস্থানের উপর বিস্তৃত হয়। তৃতীয় নায়ক আলোয় আসে। অন্ততমা উচ্চস্থানের পার্শ্বদেশ আশ্রয় করে

ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন। দুজনেই এখন আলোর পরিধির মধ্যে—কিন্তু পৃথক, স্বতন্ত্র।]

তৃতীয় নায়ক

নিশ্চিন্ত আরামে আমার আকাশ-বিলাস,
চক্রপাণি আমার সহায়—
ওরা বলে, ওরা নাকি নারায়ণী সেনা—
শত লক্ষ দুর্যোধন জড় হবে সমন্তপঞ্চকে,
মুষ্টিমেয় ভীমসেন সব দ্বৈপায়নে যাবে বিসর্জন।
গদাযুদ্ধে ধরাশায়ী হয়ে।
কিন্তু পণ্যমূল্যে কিনে নেওয়া শকুনির পাশা
আমাকে সংবাদ দেয়,
ওরা সব উরুদেশে অশক্ত দুর্বল,
আমি তাই প্রতীক্ষায় আছি, চক্রপাণি আমার সহায়।
আরও সহায় আছে।
ভীষ্ম কৃপ আদি কিছু কিছু কুরুবৃদ্ধ আমার সহায়।
তাঁরা জানেন—মাঝে মাঝে যখন তাঁরা শরশয্যায় শায়িত
থাকেন, তখন পাতাল-ভেদী অমৃত-নির্ঝর তাঁদের
কণ্ঠকে সিক্ত রাখে। দেবতাত্মা হিমালয়ের ঔপনিষদিক
মহিমায় তাঁরা আচ্ছন্ন। তাই সীমাবদ্ধ তাঁদের পায়ের
ঊর্ধ্বগতি। তাঁদের সংশয়, নির্বাসিত ঐ সংশপ্তকেরা একদিন
তাঁদেরও প্রাণদণ্ড ঘোষণা করবেন।
আমি যে দেখেছি—ঐসব ধূর্জটিদের তৃতীয়
নেত্রে ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হ'লেই ঐসব কুরুবৃদ্ধের
দল—ক্রোধং প্রভো সংহর সংহর—
বলে চিৎকার করেন।

তাই তো আমার ভরসা,
আর পাশে নিয়ে পঞ্চভর্তা-দ্রৌপদী আর প্রিয় সারমেয় এক,
নিশ্চিন্ত আরামে আমার আকাশ-বিলাস।
আর শেষপর্যন্ত তো ঈশ্বর আছেনই।
'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা',
আমি যেন—'হে ভারত ভুলিও না,' ব'লে—আমার
প্রয়োজনমত তারে বা বেতারে তাঁকে
পুনঃসম্প্রচারিত করতে পারি।

অন্যতমা

আমি আমার ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছি—
এই সব অস্থির চঞ্চল নগরীর সীমা ছাড়িয়ে,
বহু দূরে,
অতীতের পচাকাঠ নোয়াহ্‌র জাহাজে।
কক্ষে কক্ষে মৃত সব মানুষের দল,
পাটাতনে স্থবিরত্ব অহংকার করে,
তার মাঝে পেয়েছি আমি ঈশ্বর-সন্ধান,
সমাধি ক্ষেত্রের সেই আঁকাবাঁকা পথে।
আমার একান্ত কামনা,
তিনি যেন পুনঃসম্প্রচারিত হ'ন,
সামান্য তিনি, সামান্যই তাঁর গৌরব,
নাম নেই, প্রায় বদনাম,
বাস্তবের পাড়াতে তাঁর প্রবেশ নিষেধ—
কিন্তু যারা অমরত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত নয়,
যারা দীনভাবে শুধু মৃত্যুরই অপেক্ষা করে,
তাদের মুক্তির তিনি একান্ত আশ্রয়।

[অন্ধকার দুজনকে আবৃত করে মঞ্চের বামকোণে উচ্চস্থানের উপর চতুর্থ নায়ককে দেখা যায়।]

চতুর্থ নায়ক

কুলপতি থেকে আমি পৃথক হ'য়ে এসেছি।
সংশপ্তকেরা আমায় সম্মান দিয়েছে,
তারা আমাকে ব্যূহপতি ব'লে ঘোষণা করেছে,
বিধানসম্মত আশ্রয় আমার নিশ্চিত।
আমার নিজস্ব আকাশ আজ রৌদ্রেতে উজ্জ্বল।
আমার এ-রৌদ্রেতে কিন্তু মধ্যাহ্ন নেই,
চিরকাল শুধু এক সুন্দর সকাল।
সকালের এই রোদে দূরের ঐ সংশপ্তকেরা
যেন উজ্জ্বল কৃপাণ,
মধ্যাহ্নের উগ্রতাবিহীন, সমুদ্রের মতই সুন্দর।
ঊর্ধ্বের বিশুদ্ধ আকাশ দ্বারা সীমাবদ্ধ এই পৃথিবীখণ্ড আজ
আমার অশ্বের হ্রেষায় মুখরিত। ভূমিপতির লক্ষণে
আমি লক্ষণান্বিত; এই উচ্চস্থান আজ আমার
নিজস্ব, পরিপার্শ্বের এই ভূমিখণ্ড আজ আমার
বলীবর্দের কর্ষণাধীন।
দূরে ঐ সংশপ্তকেরা সূর্যের মত উজ্জ্বল।
ওরা যেন ওদের ঔজ্জ্বল্যে আমাকে আচ্ছন্ন না করে,
আমি শুধু ওদের সূর্যশক্তিকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব
করতে চাই।
ওদের ঐ সৌরশক্তি আমার রাত্রির অন্ধকারকে গানের
মত উজ্জ্বল করেছিল;
ঊষার সিন্দুর মুহূর্তে আমার মনের শূন্যতায়

সেই গীতান্বিত আলো
যেন স্বপ্নের মতন,
তবু কিন্তু সে-আলোয় আমার জন্মগত অধিকার,
কারণ ওরা আমাকে ওদের বৃহস্পতি ব'লে ঘোষণা করেছে।
আমার আসন আমি নিশ্চিত করেছি,
ভূমিপতি আমি, শস্যের উপর আমার অধিকার জন্মেছে,
লবণ আমার আয়ত্তে,
মিত্র-বরুণ আজ আমাকে তাঁদের সমকক্ষ
ব'লেই মনে করেন।
হে সংশপ্তকগণ, তোমরা আমাকে বৃহস্পতি
ব'লে ঘোষণা করেছ,
আমি এই উচ্চস্থানে অবস্থান ক'রে
তোমাদের মধ্যেই বাস করি।
তোমাদের মধ্যেই আমার শক্তির অনুভব,
তোমাদের শক্তিতেই আমি কুলপতি
নোয়াহ্‌কে পরাস্ত করেছি,
তোমাদের শক্তিতেই আজ আমার চন্দ্রাতপের চূড়া
ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে।
তোমরা আমাকে বৃহস্পতি ব'লে সম্বোধন করেছ ব'লেই
আজ আমি ভাবশুদ্ধ চিত্তে দিবসাধিপতি সূর্যের
সম্মুখীন হ'য়ে বেলাভূমির লবণ খণ্ডের ঔজ্জ্বল্যে
উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছি।
তোমরা যেন এই সকালের মতই উজ্জ্বল থাক,
মধ্যাহ্নের মত উগ্র হ'য়ো না,
তোমরা যেন আমাকে বিশ্বাসঘাতক ব'লে

পরিত্যাগ ক'রো না।

হে সংশপ্তকগণ,

দিনের আলো আমাকেও তোমাদের

ভয়ে ভীত ক'রে তোলে।

তাই রাত্রির স্বপ্নের অন্ধকারে, আমি তোমাদের

জমায়েতে উপস্থিত থেকে আমার আত্মার সপক্ষে

কিছু বিশুদ্ধ বাণিজ্য ক'রে এনেছি। সামান্য এই লাভটুকু

তোমরা নিশ্চয় ক্ষমা করবে।

হে সংশপ্তকগণ,

তোমরা আমাদের বৃহস্পতি ব'লে সম্বোধন করেছ,—

আমি তোমাদের আদেশ করছি

তোমাদের নিকট উপস্থিতি যেন আমাকে ভীত না করে,

তোমাদের মধ্যেই আমি আমার শক্তিকে অনুভব করি

কিন্তু অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ত্রিশঙ্কু আমি

হে সংশপ্তকগণ,

উত্তেজিত ক্রুদ্ধ ভাস্করের নিকট উপস্থিতি আমার

সহ্যসীমাকে অতিক্রম করে।

[অন্ধকারে আবৃত হ'য়ে যায়। দক্ষিণ দিকের সম্মুখস্থ উচ্চস্থানের উপর পঞ্চম নায়ক।]

পঞ্চম নায়ক

আমি কুলপতি নোয়াহ্।

আমার কিন্তু কোন স্বগতোক্তি নেই

অধিনায়ক মিত্র বরুণের কাছে আমি

আমার প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।

হে মিত্র,

তোমারই মত আমার সকাল আর দিনের শৈশব
রাত্রির চন্দ্রাতপের মধ্যে পথ ক'রে নিয়ে
নিরাকার ঈশ্বরের মতই
প্রসন্ন আমার মুক্তচিত্তকে বিধৃত করেছে।
নীচের ঐ মহাজনারণ্যকে আমি তোমাদেরই আদেশে
কলহে মলিন করেছি।
আমিও কিন্তু তোমাদের ঈশ্বরের মতই অনন্ত নির্জন,
আমেন, আমেন।
ঐ সব দাবিদাওয়া, ঐ সব অতি-ক্ষুদ্র-ভগ্ন-অংশ ভাগ
আমারই নির্দেশে।
তবু আমি ঐ সব মালিন্যের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থান ক'রে
তোমারই মত আমার নিঃশব্দ সভায়
ঐশ্বরিক নিস্তব্ধতায় বিরাজ করেছি,
আমেন, আমেন।
হে মিত্র,
তোমার কাছে আমার প্রার্থনা
তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'রো না।
হে বরুণ,
আমি কুলপতি নোয়াহ্,
আমি তোমার কাছে প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।
তোমার আদেশে আমি সংশগুকদের সংশয়াম্বিত
করার চেষ্টা করেছি
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।
হে বরুণ
পণ্যমূল্যে আমি তোমার শকুনির পাশা বিক্রয় করেছি

তুমি সংবাদ সংগ্রহ করেছ—হয়তো বা সংশপ্তকেরা
উরুদেশে অশক্ত দুর্বল।
হে বরুণ—আমি জানি,
ভীষ্ম কৃপ আদি কিছু কিছু কুরুবৃদ্ধ যখন শরশয্যায়
শায়িত থাকেন তখন পাতালভেদী অমৃত-নির্ঝর তাঁদের
কণ্ঠকে সিক্ত রাখে।
সেই নির্ঝরের লোভে লুব্ধ ক'রে, হে বরুণ, আমি ঐ সব
কুরুবৃদ্ধকে তোমার সহায় করেছি
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।
হে বরুণ,
রথস্বামী যেরূপ শ্রান্ত অশ্বকে পরিতৃপ্ত করেন,
আমি সুখের জন্য সেইরূপ স্তুতি দ্বারা তোমার মন
প্রসন্ন করি।
পক্ষিগণ যেরূপ নিবাসস্থানের দিকে ধাবমান হয়,
আমার ক্রোধ-রহিত বিনীত-চিন্তাসমুহ সেইরূপ ধনপ্রাপ্তির
জন্য তোমার দিকে ধাবিত হইতেছে
হে বরুণ,
তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ ধনদান কর।
সংশপ্তকেরা যাহাকে বৃহস্পতি বলিয়া অভিহিত
করে আমি তাহাকে হীন প্রমাণ করিবার জন্য
প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছি,
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তুমি আমার এই সামান্য
পরিশ্রম গ্রহণ কর।
হে বরুণ,
তুমি সুবর্ণপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপন

পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন কর,
আমার একান্ত প্রচেষ্টায় তোমার হিরণ্যস্পর্শী রশ্মি
চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া কৃষ্ণ ও পীতের মধ্যে
বিভেদ সৃষ্টি করে,
হে বরুণ,
তোমার রক্ষণাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমি তোমায়
আহ্বান করিতেছি,
তুমি আমাকে সুখী কর,
আমার উপরের পাশ মোচন কর।
মধ্যের পাশ মোচন কর,
নীচের পাশ মোচন কর, আমি যেন জীবিত থাকি।
হে বরুণ, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

[মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। সামান্য ক্ষণের জন্য এই অন্ধকার-বিরতি। তারপর মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হইয়া উঠে। নিজ নিজ উচ্চস্থানের উপর প্রথম হইতে পঞ্চম নায়ক দণ্ডায়মান। মধ্যস্থলে অন্তমা]

অন্তমা

সমাধিক্ষেত্রে আমি আমার ঈশ্বরকে প্রোথিত
ক'রে এসেছি, চিতায় তিনি দাহ হয়েছেন।
মৃতের ঈশ্বর তিনি, শবদেহের মতই প্রাণহীন,
ভস্মসাৎ মৃতদেহের মতই বায়ুতে বিলীন,
পাত্রাধার তৈলের মতই অস্তিত্ববিহীন।
যতদিন তিনি সঙ্গে ছিলেন,
ততদিন তিনি আমারই মত ক্ষুধার্ত ছিলেন।
আমি শীতার্ত হ'লে তিনিও শীতার্ত হ'তেন, আমার

জিঘাংসা তাঁকেও জিঘাংসু ক'রে তুলত।
আমি পিপাসার্ত হ'লে তাঁরও পিপাসা পেত,
আর আমি যখন ক্রুদ্ধ হ'তাম, তখন তিনি ভৈরবের মত
জটাজাল বিস্তৃত ক'রে তৃতীয় নেত্রে
অগ্নি প্রজ্বলিত করতেন।
অতীত স্মরণে এলে আমি তাঁকে আমার দেহ-বিক্রয়ের
কথা বললাম—
শুনলাম—তিনিও নাকি বহুবার, পণ্যমূল্য নিয়ে
বারবনিতার মত নিজদেহ বিক্রয় করেছেন—
বহুযুগ ধ'রে তিনি বহুজন ভোগ্যা, বহুজনপদবধূ।
মনে হ'ল,
আমার ঈশ্বর আমারই মত ক্লান্ত এক প্রাণী,
মৃত এক স্বর্গরাজ্যের কামনায় আমারই সঙ্গে চলেছে
—আমারই মত নিজেকে টানতে টানতে!
গর্দভ-ক্লান্ত এক আমিকে বৃথা বহন ক'রে লাভ কি?
তাই সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে প্রোথিত ক'রে এলাম,
চিতায় তাঁকে দাহ করে এলাম,
এক মুঠো ছাই তিনি, বায়ু তাঁকে তুচ্ছ করেছে,
পচা-ঘুণধরা অতীতের মরা কাঠ,
কুলপতি নোয়াহ্‌র জাহাজে তিনি পরিণত হয়েছেন।
তারপর সেই পুরাতন দিন,
সেই জনপদবধূ,
সেই রক্তমাখা-খড়িমসা স্থবিরা নগরী।
কিন্তু ধূলি ধূসরিত আমি,
মৃত এক ঈশ্বরবহনে বিগত-যৌবন,

স্থবিরা নগরী তাই দ্বার বন্ধ করে,
নায়কেরা করে পরিত্যাগ।
তারপর সংশপ্তক আশ্রয়।
বিস্মিত হ'য়ে দেখি তাদের ক্ষুধা আমাকে ক্রোধান্বিত
করে, তাদের পিপাসায় আমি জিঘাংসু হই,
তাদের আবেগ আমার দুই মুষ্টিকে
ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করে।
আমি আমার পণ্যমূল্য ধার্য করেছিলাম,
কিন্তু তাদের খেটে খাওয়া বাহুমূলের বিবরে
কোন যৌনগন্ধ নেই,
সেখানে শুধু অম্লগন্ধ স্বেদের আঘ্রান,
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদে দিগন্ত মুখর।
[মঞ্চের দুই দিক দিয়া সংশপ্তকদের প্রবেশ। মঞ্চের পিছন দিকে উচ্চস্থানগুলিকে ঘিরিয়া অর্ধাবৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করে।]

সংশপ্তক একতান

শোনা যায়,
রক্তহীন সংগ্রামের পর,
আমরা ফিরেছি ঘরে।
আমাদের ইতিহাস অন্য কথা বলে
বার বার রক্তক্ষয়, কুরুক্ষেত্র উদ্‌বেল দুর্বার,
অপমানে-লাঞ্ছনায় সংগ্রাম-উত্তর,
ভারতের জম্বুদ্বীপ বিদ্রোহে মুখর।
কিন্তু কুলবৃদ্ধ ভীষ্মদেবগণ,
বারে বারে করেন প্রতিজ্ঞা,
—হীন সূতের নন্দন সব সংশপ্তকগণ

যদি নেয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ
সেনাপত্য ভার তাঁরা করিবেন ত্যাগ।
তাই অন্ধ-বধির-মূক তিনটি বানর
বলে নাকো মিথ্যা কথা, শোনে নাকো কানে,
দৃষ্টির গোচর নয় মিথ্যা-আচরণ,
অজাদুগ্ধ পান ক'রে
সত্যমেব জয়তে ব'লে ক'রে যায় শান্তির প্রসার।

[ক্ষণিকের স্তব্ধতা]

সংশপ্তক একতান

আমরা ঘরেতে ফিরি
রক্তহীন সংগ্রামের পর।
একদিন আমাদের মাথা উঁচু ছিল,
দৃষ্টিতে ছিল উদ্ধত অহংকার,
ভারাক্রান্ত হৃদয় আজ আনত লজ্জায়।
আমাদের নিজস্ব অহংকারে একদিন কি
আমরা সংগ্রাম করি নি ?
তার কোন্ মূল্য ধ'রে দিলে—
তোমাদের রক্তহীন সংগ্রামের পর ?
আমরা সূর্যের সৈনিক,
আমরা আমাদের অহংকার নিয়ে অমর ছিলাম,
হে কৌপীণধারী বৃদ্ধ পিতামহ,
ছল ক'রে চেয়ে নিলে বহুল্ল সে কবচ-কুণ্ডল,
সত্য আর অহিংসার পথে,
বৈদেশিক-ব্যবসার লাভ-ক্ষতি ভগ্ন-অংশ ভাগে,

চক্রান্তের গোপন পথে,
নিঃশব্দে নিহত হ'ল সেই অহংকার,
তার কোন্ মূল্য ধ'রে দিলে
তোমাদের রক্তহীন সংগ্রামের পর?
মাঝে মাঝে রাজসূয় যজ্ঞ ক'রে
মূল্য ব'লে ধ'রে নাও শত-লক্ষ প্রাণ,
পুরস্কারে কণ্টকমুকুট,
বেয়নেট-গুলিতে জর্জর,
তারপর নির্বাসন—জান্তব-জীবন।

[ক্ষণিকের স্তব্ধতা]

সংশপ্তক একতান

মধ্যরাত্রির প্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত হ'য়ে আমরা ফিরেছি ঘরে
রক্তহীন সংগ্রামের পর—
আজ সে শপথ, রামধনু-রঙ হ'য়ে
আকাশেতে আলো দেয় তোমাদের গন্ধর্ব-সভায়—
তারপর অসীমে মিলায়—সেখানে সমাধি তার।
সভা শেষ হ'লে,
ফুল দেবে, মালা দেবে যত সব ব্যর্থ-গঙ্কালে,
অতীতের পাপের পটেতে।
কিন্তু শোন গন্ধর্বের দল,
এখনো আসেনি সময়,
অতীতের যত পাপ
মালা দিয়ে সাজাবার আসে নি সময়।
এখনো ক্ষয়ে-যাওয়া সময়ের অন্তরালে রাত্রির অন্ধকার

আগামী কালের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়নি—
এখনো গুরু গুরু বিদ্রোহ-বাদ্য বনভূমি কম্পিত করে,
তারায় তারায় প্রতিধ্বনিত হয় নক্ষত্রের ছায়াপথে—
এখনো দীর্ঘ সব বনস্পতির মাথায় মাথায়
ঘোরবর্ণ সূর্যের আবির্ভাব—মেঘরঙে ঢাকা—
সূর্যের সৈনিক আমরা—
সপ্তাশ্ব বাহিত হয়ে,
আমরা ফিরেছি ঘরে রক্তহীন সংগ্রামের পর !

[ক্ষণিকের স্তব্ধতা]

ঊষার বিভ্রান্ত পদক্ষেপে
আমরা ফিরেছি ঘরে রক্তহীন সংগ্রামের পর।
দুনিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষের গান,
গীত হয় আমাদের সুরে,
—অন্য সব দেশ কিন্তু একই আকাশ।
কঠোর কঠিন মৃত্যু-পদক্ষেপে
আমরা ফিরেছি ঘরে রক্তহীন সংগ্রামের পর।
তবু কিন্তু তোমাদের গন্ধর্ব সভা থেকে নিক্ষিপ্ত কাঞ্চনমুদ্রা
আমাদের হাসি-গল্প-গানের কণ্ঠরোধ করে,
রক্তহীন-সংগ্রামের গল্পে-বলা-ঐতিহ্যকে
অস্বীকার ক'রে মৃত্যু তার সবুট-পদক্ষেপে
আমাদের দিকে অগ্রসর হয়।
অথচ রক্তহীন সংগ্রামের পর
আমরা ফিরেছি ঘরে পাহাড়ের সবুজের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে,
পিপাসার্ত হ'লে পাখীর উষ্ণ-নরম গান
আকণ্ঠ পান করেছি,

সমুদ্রের তীরে এসে দেখেছি
তরঙ্গে তরঙ্গে ভরা জলের ফসল ;
ঘণ্টাধ্বনি বন্দরের কালশেষ ঘোষণা করে,
প্রেমার্ত্ত সামুদ্রিক পাখীরা চুম্বনে চুম্বনে তরঙ্গশীর্ষ
আকুল করে তোলে।
আমরা ফিরেছি ঘরে,
বৃষ্টীপাত বিরামবিহীন,
বজ্রাহত বিস্রস্ত উষায়
পথে পথে মূঢ় ম্লান মুখ
অর্ধমৃত যন্ত্রণা কাতর—
সম্মানের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,
আজো তারা আছে,
সেই-সব মূঢ় ম্লান মুখ
মৃত কিংবা যন্ত্রণাকাতর।
সেই আশাহত পথ বেয়ে বেয়ে
আমরা ফিরেছি ঘরে বিস্রস্ত উষায়,
রক্তহীন সংগ্রামের পর।

[মঞ্চের বামপার্শ্ব দিয়ে দ্বিতীয় সংশপ্তক দলের প্রবেশ]

সংশপ্তক (দ্বিতীয়) একতান

হে পঙ্ক নায়ক,
বিগত বিশ বৎসর তোমাদের সভ্যতা
দিবারাত্র আমাদের পদাঘাত
ক'রে এসেছে,
তোমাদের পোষা শকুনদের ডানার ছায়ায় পুঞ্জীভূত রক্ত দিয়ে
গড়া স্মৃতিস্তম্ভ সব,

তারা তাদের তীক্ষ্ণ নখরের অগ্রভাগ দিয়ে
বিন্দু বিন্দু রক্ত সঞ্চয় করেছে
ধানক্ষেতে কাজ-করা কৃষকের রক্ত,
কারখানায় খেটে-খাওয়া মজুরের রক্ত,
বন্দুকের গুলী মেরে ভেঙে-দেওয়া-প্রতিজ্ঞার রক্ত
কিন্তু তোমাদের শকুনেরা বোধ হয় জানে না,
তোমরা বোধ হয় জান না, হে পঞ্চপাণ্ডব
বেদব্যাসের কাল শেষ হয়েছে।
তোমরা বোধ হয় জান না হে পঞ্চ নায়ক,
গন্ধর্বসভায় তোমাদের উদ্ধত সংগীতের প্রতিবাদে
আমাদের কর্কশ কণ্ঠের ছিন্নভিন্ন গান,
আমাদের উজ্জ্বল পদক্ষেপ,
সবুজ বসন্ত আনে রক্তের তর্পণে।

[মঞ্চের দক্ষিণ দিক দিয়া তৃতীয় সংশপ্তক দলের প্রবেশ

সংশপ্তক (তৃতীয়) একতান

শোন কমরেডরা শোন,
আমরা পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দিয়ে আসছি
আমরা সংবাদ নিয়ে আসছি
আমাদের বাহুমূলের বিবরে কোন সভ্যতা নেই ব'লে
এই সব নায়কের দল,
ব্যর্থতার আঁকা-বাঁকা পথে,
আমাদের পিতার মত বৃদ্ধদের হত্যা করেছে
আমাদের মায়ের মত মেয়েদের হত্যা করেছে
কচি কলাপাতার মত শিশুদের হত্যা করেছে
তারা বেদনার্ত, কিন্তু বিষণ্ণ ছিল না,

শেষ মুহূর্তেও চোখ তাদের আশায় রঙিন,
ভালবাসায় উষ্ণ তাদের নিঃশ্বাস।
তাদের মৃত্যুতে আমরা দিগ্‌ভ্রষ্ট আমরা,
মনে হয়েছিল, পথভ্রষ্ট আমরা
মাতৃস্তন্য থেকে দূরে সরে আসছি
কিন্তু না কমরেডস
আমাদের সমস্ত দুঃখকে অতিক্রম ক'রে
ঘুমভাঙা-বুনো জানোয়ারের বিশুদ্ধ সকালকে
অতিক্রম ক'রে
'একশো লোকের বন্দীশালা ভাঙা'র
প্রচণ্ড চিৎকার আমাদের কানে এল
অমনি নির্বাসিত আমাদের রক্তের ধারা
কুয়াশা-তাড়িয়ে-দেওয়া
শক্তিকে আবিষ্কার করল
শতাব্দীর ডাক শুনতে পেলাম কম্‌রেডস্
আফ্রিকার নিগ্রোরা আমেরিকার
নিগ্রোদের সঙ্গে মিলে
এশিয়ার নিগ্রোদের ডাকছে
উঠে পড় কম্‌রেডস্, অন্ধকার শেষ,
এবার উষার ঘুম ভাঙছে।

[অনুত্তমাকে নিয়ে সমস্ত সংশপ্তকেরা এক হ'য়ে যায়। পতাকাবাহীর হাত থেকে অনুত্তমা সংশপ্তকদের পতাকা গ্রহণ করে। সংশপ্তকেরা ব্যূহ রচনা করে উচ্চস্থানগুলির দিকে অগ্রসর হয়। পঞ্চ নায়কেরা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হন। অর্ধবৃত্তাকার ব্যূহের মধ্যে অসহায় জন্তুর মত তাঁদের অবস্থা।]

সংশপ্তক একতান॥

দূরে একটা আলো দেখা যায়
ঐ আলো আমাদের পথ দেখাচ্ছে,
অন্ধকার শেষরাতের কালো মুখের আড়ালে
উষার সলজ্জ মুখ আমাদের বাসনায় রাঙা হ'য়ে উঠেছে।
ঢেউ-এর পর ঢেউ আমাদের নোঙর-ফেলা জাহাজে
আঘাত করছে,
আজ রাত পর্যন্ত যারা গণিকা ছিল,
তারাও আজ আনন্দে অধীর হ'য়ে খদ্দের-নয়-এমন
মানুষকেও আলিঙ্গন করছে!
এখনও আছে কিছু হতাশের দল,
সকালের ধোঁয়াটে কুয়াশার জন্য এখনও তারা উন্মুখ
এখনও আছে কিছু উদ্‌ভ্রান্তের দল,
তাদের মেঘাচ্ছন্ন আঁখিতে ইউক্যালিপ্টাসের গন্ধে
ঘেরা এক দ্বীপ,
এখনও তারা জাহাজের জন্য উন্মুখ
এখনও আছে কিছু বৃদ্ধের দল,
ব্যর্থ-বাসনার বিরক্তি নিয়ে ঘোরাফেরা করে—
কিছু-একটা-হ'তে পারে—এ আশায় এখনও উন্মুখ।
এখনও আছে,
শকুনির পাশা নিয়ে কিছু কিছু বাজীমাত করা,
কিংবা কোন প্রাচীন কলহ,
এখনও কিছু পাপ আছে,
আছে কিছু কুয়াশার ঘুম,
কিছু কিছু সমুদ্র কিন্তু এখনও হ'য়ে আছে নীল।

[মশালবাহী শেষ-সংশপ্তকদের প্রবেশ ।]

সংশপ্তক (শেষ) একতান

আমরা আসার পথে দেখলাম,
চাষারা যাচ্ছে তাদের ধানক্ষেতের পথে ।
আমাদের ভাঙা ঘরের উঠোনে উঠোনে,
আজ কী অপরিমেয় শক্তির সঞ্চয়,
রাজসূয় যজ্ঞে গুরুভোজনে যে সব রাজারা ক্লান্ত হ'তেন,
তারা আজ আমাদের ছাদের তলায়,
আমাদের দরজার বাহিরে বাহিরে,
রাজা আর রাষ্ট্রদূত—কুরু-কাশী-কোশল-পাঞ্চাল ।
আমরা রোজ রাস্তায় দেখতাম
কুলবৃদ্ধ পিতামহেরা নিক্তির ওজন আর বাটখারা নিয়ে
আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন—
আমাদের আহার্য মেপে দেবেন ব'লে অপেক্ষা করছেন—
আমাদের বিচরণক্ষেত্র সীমিত ক'রে দেবেন
ব'লে অপেক্ষা করছেন—
হায়—সেই পিতামহের দল আজ কোথায় ?
পথে আসতে আসতে দেখলাম,
তাঁরা তাঁদের দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারা নিয়ে,
খড়কুটো আর কীট-পতঙ্গের সঙ্গে
সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন ।
সূর্য—আজ তোমাকে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি ।
সূর্য—আমরা তোমাকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ব'লেই জানতাম ।
সূর্য—তোমার সম্পর্কে অনেক মিথ্যা রটনা আমরা শুনেছি ।
সূর্য—পৃথিবীতে আমাদের পরিচয় ছিল—আমরা সব

হীন সূতের নন্দন।

সূর্য—আমরা কিন্তু জানতাম, আমরা তোমার সন্তান।

সূর্য—শুভ্রবর্ণ তোমার কিরণে আজ

বিপ্লব-সংগীত গীত হয়েছে।

সূর্য—আজ তোমাকে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি।

আমরা যখন নদীপথ দিয়ে আসছি,

তখন দেখি প্রভাতের প্রবাহিণী প্রসবক্লান্ত

নারীর মতই প্রসন্ন,

আমরা যখন রাস্তা দিয়ে আসছি

তখন দেখি পৃথিবীটা আর রক্তবর্ণ মেঘচর্মে আবৃত নয়,—

সে তখন অনেক সুন্দর।

আমরা আসার পথে দেখলাম,

অজ্ঞাত সৈনিকের দল,

তাদের পাথরে-গাঁথা কঠিন স্মৃতিস্তম্ভ ত্যাগ ক'রে

সবুজ পোশাক প'রে আমাদেরই পিছন পিছন আসছে,

আমাদেরই পতাকা বহন ক'রে।

[ব্যূহ সংকীর্ণ হয়। অন্যতমা সংশপ্তক-পতাকা উত্তোলন করে মধ্যে নায়কবৃন্দকে অসহায় জন্তুর মত দেখায়। পর্দা নেমে আসে।]

যবনিকা

কেয়াকুঞ্জ

বিভূতি মুখোপাধ্যায়

চরিত্র

রাখহরি, সুবল, ষষ্টিচরণ, শ্রীধর,
রাইমণি এবং অনেক আগন্তুক।

[গ্রামের নাম কেয়াকুঞ্জ। সুন্দর বনের বাদা অঞ্চলের একটি নগণ্য গ্রাম
গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাখহরি সাঁপুই-এর পর্ণকুটির।

রাখহরির বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখলে তাকে বৃদ্ধই মনে হয়
ছেলে ষষ্টিচরণের বছর কুড়ি বয়স। খঞ্জ। একটা পা টেনে টেনে হাঁটে
অতিরিক্ত মেজাজ।

রাইমণির বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। চেহারায় যুবতীই বলা যায় যদিও হতশ্রী

সময় সন্ধ্যা। রাইমণি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে শাঁখে ফুঁ দেয়। অল্প অল্প বিরতি
পর এধার ওধার থেকেও শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। তিনবার শাঁখে ফুঁ দিয়ে দাও
থেকে আঙিনায় নেমে আসে রাইমণি। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালায়, গল
আঁচল দিয়ে প্রণাম করে দেবতার উদ্দেশ্যে। দাওয়ার কোণে একটি ছায়ামূ
দেখা যায়। প্রমত্ত মূর্তি। বাঁশের খুঁটি ধরে কোনরকমে নিজেকে সাম
সে এগিয়ে আসে। স্বল্পালোকিত সন্ধ্যায় দেখা যায় মূর্তিটি ষষ্টিচরণে
রোগা, বীভৎস চেহারা। একমাথা রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। ভাঙা গাল, কোটরাগ
চক্ষু। সারামুখে লাম্পট্যের অভিজ্ঞান। দাওয়ার ধারে এসে ষষ্টিচরণ জড়ি
কণ্ঠে ডাকে।]

ষষ্টি॥ মা—মা—

[প্রণাম রত রাইমণি সাড়া দেয় না]

মরেছে নাকি—এই মা। হারামজাদী গেল কোথায়?…মা…দেখদিনি …সুবলা ওদিকি পচাইয়ের হাঁড়ী নে বসে আছে, আর ইদিকে চিল্লে চিল্লে আমার গলা ফেঁড়ে গেল তবু দেখা নেই! এই মা…

রাইমণি॥ কি বলছিস!

ষষ্টি॥ তুই ওইখেনে! চিল্লে চিল্লে আমার গলা ফেঁড়ে গেল শুনতে পাসনি?

রাইমণি॥ ঠাকুরির থানে পিদ্দিম ধরেছিনু—দেখতে পালনি?

ষষ্টি॥ পিদ্দিম ধরেছিলি! না ওইখেনে খিচ্‌কি মেরে পড়েছিলি পাছে আমারে পয়সা দিতি হয় বলে?

রাইমণি॥ পয়সা! কারে পয়সা দেবো!

ষষ্টি॥ আমারে দিবি আবার কারে! আমি তোর ছেলে ষষ্টিচরণ!

রাইমণি॥ তুই আবার নেশা করেছিস!

ষষ্টি॥ আখোন সম্পূন্ন করিনি। করবো! সুবোল ওই বাবার থানে পচায়ের হাঁড়ী নে বসে আছে! পয়সা দে!

রাইমণি॥ পচাইয়ের হাঁড়ী তো এনেছে সুবোল, আবার পয়সা কি হবে!

ষষ্টি॥ মাইরী আর কি? পয়সা কি হবে! পয়সা না দিলি রাধিকে ঘরে ঢুকতে দেবে না, বলে পয়সা কি হবে! দে বলছি!

রাইমণি॥ আমার ঠেঙে পয়সা নে তুই রাধিকার ঘরে যাবি একথা বলতে তোর মুখে আটকালো না?

ষষ্টি॥ আমি ওসব কিছু বলিনি। তুই পয়সা দিবি কি না বল!

রাইমণি॥ না! পয়সা নেই!

ষষ্টি॥ দিবিনি?

রাইমণি॥ না! বলনু তো পয়সা নেই।

ষষ্টি॥ তোর বাবা দেবে!

রাইমণি॥ ভর সন্ধ্যেবেলা গালমন্দ করিসনে বলছি ষষ্টি!

ষষ্টি ॥ ভালচালতো পয়সা দে! নৈলে সিদিনের মত চুলের ঝুঁটি ধরে মুখটা আবার ছাইগাদায় রগড়ে দেবো! দে বলছি...

রাইমণি ॥ তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দাঁড়া আজ তোর ঝেঁটিয়ে আমি বিষ ঝাড়ছি।

[একটা ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে যায়। ষষ্টিচরণ কিছু বোঝবার আগেই সপাসপ ঝাঁটার বাড়ী মারতে থাকে]

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার চুলের ঝুঁটি ধরে তুই ছাইগাদায় আমার মুখ রগড়াবি! হারামজাদা ড্যাকরা ছেলে আমি পেটে ধরেছিনু...বল...বল...আর গাল পাড়বি...

ষষ্টি ॥ (মার সামলায়) ভাল হচ্ছে না বলছি...

রাইমণি ॥ (ঝাঁটা চালিয়েই যায়) বাপ সেই সকাল থেকে তাড়িখানায় পড়ে আছে...সারাদিন পেটে এক দানা কাঁচা চালও পড়েনি! আর ছেলে সন্ধ্যেবেলা পচাই খেয়ে এলো পয়সা চাইতে, রাধিকে ঘরে ঢুকতে দেবে না।...হারামজাদা তোর নেশা আজ ছোটাচ্ছি আমি...বল...বল... বল আর গাল দিবি...দিবি আর গাল... [হাঁফায়]

ষষ্টি ॥ (সরে যায়) তুই আমারে মারলি! (মুখ মোছে। কষবেয়ে গড়ান রক্ত হাতে লাগে) মুখ দে আমার রক্ত বার করলি...

রাইমণি ॥ বেশ করেছি!

ষষ্টি ॥ তুই আমার মুখ দে রক্ত বার করলি! (স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাইমণির দিকে)

রাইমণি ॥ অক্তপাতের আখোন হয়েছে কি? তোরে আমি খুন করব আজ!

[আবার ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে যায়]

ষষ্টি ॥ ভাল হবেনি বলছি...থুয়ে দে ঝাঁটা... তবেরে! (দাওয়া থেকে একটা বাঁশ তুলে নেয়) আয় আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

[বাঁশ তুলে হিংস্র শ্বাপদের মতো এগোয় রাইমণির দিকে। ছেলেকে

হিংস্র রূপ দেখে ভয় পায় রাইমণি। ঝাঁটা হাতে করেই একপা একপা করে পেছোয় সে।]

রাইমণি ॥ কেন বলছি! বাঁশ ফেলে দে ষষ্টি।...

ষষ্টি ॥ তুই আমার মুখ দে রক্ত বার করেছিস! রক্ত! (বাঁশের বাড়ি মারে রাইমণির হাতে। ঝাঁটা ছিটকে পড়ে যায়। রাইমণি আর্তনাদ করে ওঠে) চাবী দে!...(আরো এগিয়ে আসে)

রাইমণি ॥ চাবী নেই!

ষষ্ঠী ॥ দে বলছি!

রাইমণি ॥ চাবী নেই আমার কাছে!

ষষ্ঠী ॥ দিবিনে!

রাইমণি ॥ "মা!

ষষ্ঠী ॥ দিবিনে? (অকস্মাৎ এলোপাথড়ি লাঠি চালাতে শুরু করে। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে রাইমণি) দিবিনে...দিবিনে...দিবিনে...

[মারের চোটে হতবুদ্ধি হয়ে যায় রাইমণি। কান্না থেমে যায়। ষঠিচরণ দাঁড়িয়ে দেখে কিছুক্ষণ। তারপর হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ওর আঁচল থেকে চাবী খুলে নেয়। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে যায়। রাইমনি তখনও পড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঘরের ভেতরে থেকে জামা, বাসন, গুড়ের নাগরী, তোবড়ানো টিনের সুটকেশ সব বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে ষষ্টিচরণ। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে আসে। দাওয়ায় পড়ে থাকা রাইমণির উদ্দেশ্যে বলে।]

রেতের বেলা ফিরবো! ত্যাখন যদি পিণ্ডি রেঁধে না রাখিস তো আবার মজা টের পাবি।

[খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যায়। রাইমণি পড়ে থাকে একভাবে! ফোঁপায়! সময় কাটে। নেপথ্যে শ্রীধরের ডাক শোনা যায়।]

শ্রীধর ॥ রাধহরি আছো নাকি গো…অ রাধহরি…ব্যাপার কি চারিদিকে যে সুনসান করতিছে ! রাইমণি…অ রাই…

[রাইমণি কোন সাড়া দেয় না। শ্রীধর আরো এগিয়ে আসে। নাদুস নুদুস চেহারা প্রায় যাটের কাছাকাছি। পরণে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। গলায় কণ্ঠি। মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। এগুতে গিয়ে আঙিনায় পড়ে থাকা টিনের সুটকেশে হোঁচট খায়।] এই ছাখো…এ্যাই ছাখো… (ভালো করে দেখে) ওরে বাবা, দেখি কুরুক্ষেত্তর হয়েছে। ষষ্টিচরণ ঘরে এসেছেল বুঝি !‥ (দাওয়ায় রাইমণিকে ঠাওর করে) কে ওটা।

[রাইমণি নিজেকে সামলে উঠে বসে]

রাইমণি ! ওভাবে পড়েছিলে কেন ?

রাইমণি ॥ ঘুমুচ্ছিলুম ! আপনি কখন এলেন শ্রীধর জ্যাঠা ! ‥

শ্রীধর ॥ হেঁ হেঁ হেঁ…রাইয়ের আমার এক কথা…এই এক্ষুণি আসছি…শ্রীধর জ্যাঠা ! জ্যাঠা বলাটা আর তুমি ছাড়তে পারলে না রাই…

রাইমণি ॥ গেরাম সুবাদে তো সকলেই জ্যাঠা বলে আপনারে…

শ্রীধর ॥ তাই বল…গেরাম সুবাদে…হেঁ হেঁ…তা এই ছ্যাও, ধর দিকিনি।

(পুঁটলি এগিয়ে ধরে)

রাইমণি ॥ কি ওটা !

শ্রীধর ॥ এই চাট্টি চাল ! রাধহরি যে কি করে সে তো জানি। সেই সকাল থেকে গিয়ে আমার দোকানে পড়ে আছে। অত করে বললুম আর নেশা করিসনে রাধহরি এবার ঘর যা। রাই হয়তো ওদিকি তোর পথ চেয়ে বসে আছে। তা কে কার কথা শোনে। নেশায় একেবারে টইটম্বুর। নেশার ঘোরে কেঁদে কেঁদে বললে, জ্যাঠা আজ দুদিন বাড়িতি চাল নেই ? কচুর ডগা সেদ্ধ করে তাই খেয়ে আছি ! তুমি আমারে উদ্ধার কর। একেবারে পা জড়িয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতি লাগল ! পেরথমটায় খুব রাগ হলো ! বললুম খেতে দিতে পারিস না তো আবার

দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করতে গেলি কোন সাহসে!…তারপর ভাবলুম যে না, যাই একবার…রাই ওদিকি না খেয়ে আছে…তা হ্যাও ধর!…

[রাইমণি এগিয়ে আসে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে]

ওকি চোখ মুখগুলো ফুলো ফুলো লাগছে কেন?

রাইমণি॥ অবেলা করে ঘুমুচ্ছিলাম…

শ্রীধর॥ আরে এ-যে কালসিটের—দাগ!…ইস…কে করেছে এমন ধারা! কে?

রাইমণি॥ কে আবার করবে?

শ্রীধর॥ আমার কাছে আর গুপ্ত করোনি রাইমণি! আমি সব বুঝেছি! তোমার ছেলে বষ্টেটা বাড়িতি এসেছিল বুঝি? না-না মুখ নীচু করে থাকলে চলবেনি!…এ ত ভাল কথা নয়! অনেক দিন ধরেই এসব চলছে—এবারে দক্ষিণ রায়ের পুজোর সময় এর একটা বিহিত করা দরকার!

রাইমণি॥ বিহিত করবেন··

শ্রীধর॥ ওর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ থেকে আমি বার করে দেবো।

রাইমণি॥ না-না জ্যাঠা! বাবার থানে এসব কথা তুলবেন না

শ্রীধর॥ না-না—মায়ের মন ছেলের অকল্যাণ চায় না আমি বুঝি! কিন্তুক বাড়াবাড়ি করলে পঞ্চায়েতি বিধান তো মানতেই হবে! মোড়ল মাতব্বর হয়ে তো আর নিজি চক্ষে এসব অনাচার দেখতি পারি না!

[হাত দিয়ে ওর চিবুক তুলে ধরেন, রাইমণি তীর বেগে সরে যায়। তীব্র কণ্ঠে বলে]

রাইমণি॥ জ্যাঠা!

শ্রীধর॥ কপালটা একেবারে ফুলিয়ে কালসিটে পড়িয়ে দিয়েছে গা!

রাইমণি॥ আপনি এখন আসুন জ্যাঠা!

শ্রীধর ॥ হেঁ হঁ...হেঁ—। থাকতে কি আর এলেছি রাই! যেতে তো হবেই!—তবে এর একটা বিহিত না করলে নয়! ছেলেটা তোমার বিগড়েই গেছে রাইমণি! নেশা ভাঙের কথা বাদই দিলুম! কাণাঘুষোয় আরো অন্ত কথাও শুনতে পাই।

রাইমণি ॥ কী! কী শুনতে পান!

শ্রীধর ॥ শুনতে পাই বড় সর্বনেশে কথা। চোরাই মালের লেনদেনের কারবারে নাকি ফেঁসেছে তোমার ছেলে!

রাইমণি ॥ জ্যাঠা!

শ্রীধর ॥ তোমার ছেলেটা থাকলে কি আর দুঃখ্যু দিতো! কক্ষুণো না। বড় ভালো ছেলে ছিল। মুখের দিকি তাকিয়ে—কোন কথা বলতো না! ভগবান সইলেন না তাই কুমীর ডুবির জলে গে' ডুবলো!—

রাইমণি ॥ জ্যাঠা—

শ্রীধর ॥ কি?

রাইমণি ॥ ষষ্টিচরণের ওই যে কথাটা বললেন—

শ্রীধর ॥ কি, চোরাই মালের কারবার? হ্যাঁ, কাণাঘুষোয় তো শুনতে পাই—বিহিত একটা করতেই হবে—তবে—

রাইমণি ॥ কী তবে!

শ্রীধর ॥ তুমি একটু মুখ তুলে চাইলে—

রাইমণি ॥ জ্যাঠা!—

শ্রীধর ॥ এই দ্যাখো তুমি আবার চেঁচাতে শুরু করলে—

রাইমণি ॥ তা কি করবো, আপনার এই মধুর বাক্যি শুনে মুখে ফুল চন্দন পুজো করবো। আপনি চলে যান এখান থেকে! আমার ছেলে চোর হোক, ধাউড় হোক, বদমাইস হোক তাতে আপনার কি?

শ্রীধর ॥ আঃ, তোমার মেজাজটা সত্যিই বড্ড গরম হয়ে গেছে। তোমার

অন্যে ভাবি তাই বলতে যাই। তোমার ছেলে! সতীনের ছেলে আবার নিজের ছেলে হয় কবে!

রাইমণি॥ আপনি কে আমার সাতপুরুষের নাউখোলা, যে ভর সন্ধ্যেয় একমুঠো চাল দিয়ে ভাব জমাতি এসেছেন! কি ভেবেছেন কি আপনি! ভিখিরি পেয়েছেন আমাদের!

শ্রীধর॥ তুমি কি বলছো গো রাই, রাগের মাথায়!

রাইমণি॥ চলে যান আপনি। আমরা খেতি না পাই উপোস দিয়ে থাকবো! তবু আপনার দ্বারস্থ হবো না! (পুঁটলিটা সজোরে ওর সামনে বসিয়ে দেয়) এই নিন আপনার চাল! চলে যান এখান থেকে!

শ্রীধর॥ হেঁ হেঁ হেঁ, কথায় বলে বিষ নেই তার কুলোপানা চকর। ভালো গো ভালো! চলেই যাচ্ছি। নাঃ, মানুষের ভালো করতি নেই!—তবে এও বলি রাইমণি, এ্যাতো গুমাক ভালো নয়। কথায় বলে যৌবন সময়ের মতো। অনবরত ভেসেই চলেছে, কিন্তুক ফিরতি আর আসে না। উজান নেই, শুধু ভাঁটি আছে।

রাইমণি॥ আপনি যাবেন কি না!

শ্রীধর॥ হ্যাঁ, এই যাই। তবে দক্ষিণ রায়ের পার্বণে ষষ্ঠীচরণের কথাটা আমারে তুলতেই হবে! মোড়ল মাতব্বর হয়ে অনাচার হতে দিতি পারি না!

[পুঁটলি নিয়ে চলে যায়। রাইমণি কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ছুটে ঘরে যায়। ঘর থেকে একটা নতুন ট্রানজিস্টার এবং আরো কয়েকটি টুকিটাকি চোরাই মাল বার করে নিয়ে আসে। সেগুলো লুকোবার জন্য নিরাপদ জায়গা খোঁজে। ছোট ছোট জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখে চালের বাতায়।—এই সময় পা টিপে টিপে একজন আঙিনায় প্রবেশ করে। আগন্তুক অল্প বয়সী। বছর আটাশ বয়স। সপ্রতিভ। চেহারায় গ্রামের লোকের মত নয়।

জামাকাপড়ে শহুরে সভ্যতার ছাপ। রাইমণি আগন্তুককে দেখতে পায়নি। সে তখন ট্রানজিস্টার নিয়ে ব্যস্ত ছিল। যুবকটি কৌতুক মিশ্রিত দৃষ্টীতে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। ট্রানজিস্টার রাখার জায়গা না পেয়ে রাইমণি ঘরে যেতে যায়, এমন সময় তার নজর পড়ে আঙিনার দিকে। চমকে ওঠে। হাতের ট্রানজিস্টার পেছন দিকে লুকিয়ে ভীত স্বরে প্রশ্ন করে]

রাইমণি ॥ কে ?

আগন্তুক ॥ ভেতরে আসতে পারি !

রাইমণি ॥ কে আপনি !

[আগন্তুক তার কথার উত্তর না দিয়ে এগিয়ে আসে]

আগন্তুক ॥ আপনাদের বাগানটা কিন্তু বেশ সুন্দর !

রাইমণি ॥ বাড়ীতে কেউ নেই, আপনি কোথায় আসছেন !

আগন্তুক ॥ (হঠাৎ হেসে ওঠে)

রাইমণি ॥ হাসতিছেন কেন ?

আগন্তুক ॥ আমাকে আপনি বলছেন শুনে—

রাইমণি ॥ ওমা, নতুন মানুষ, চিনিনি, জানিনি—

আগন্তুক ॥ সত্যি আপনি খুব ভয় পেয়েছেন। নৈলে দেখতেন আমি আসলে আপনার ছেলের মতন, হ্যাঁ, আমাকে আপনার ছেলে বলেও ভাবতে পারেন।

রাইমণি ॥ ছেলে !

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ ! জানেন আমার মাও ঠিক আপনার মতো। হুবহু।

রাইমণি ॥ তুমি কে ?

আগন্তুক ॥ সে অনেক কথা ! চট্ করে বললে চিনতে পারবেন না ! আমি শহরে থাকি ! মানে থাকতাম !—যাচ্ছিলাম অন্য একটা জায়গায়—

অনেক দূরে—পথ হারিয়ে ফেলেছি। ভাগ্যিস এই বাড়ীটা দেখতে পেলাম—

রাইমণি ॥ বাড়ীতে কেউ নেই এখোন—

আগন্তুক ॥ নেই! সেকি! এত রাত্তিরে সব কোথায় গেছে?

রাইমণি ॥ রাত করেই ফেরে তারা!

আগন্তুক ॥ অন্যায়! অত্যন্ত অন্যায়! একা একা আপনার ভয় করে না।?

রাইমণি ॥ না!

আগন্তুক ॥ চোর ডাকাত আসতে পারে!

রাইমণি ॥ (দাওয়া থেকে যান্ত্রিকভাবে কাঠকাটা কুড়ুলটা তুলে নেয় হাতে) আমাদের ঘরে কি আছে যে চোর ডাকাত আসবে?

আগন্তুক ॥ ওকি, ওটা হাতে নিলেন কেন?—ভয় নেই, আমি সত্যিই চোর ডাকাত নই!

[রাইমণি আগন্তুকের কথায় নিজের হাতের কুড়ুলটার দিকে তাকায়! একটু ইতস্তত করে, কিন্তু রাখে না সেটা]

আগন্তুক ॥ সত্যিই বড় দরিদ্র আপনার সংসার! (হঠাৎ) আচ্ছা এখানে আর কে কে থাকে!

রাইমণি ॥ ষষ্টিচরণ আর তার বাবা!

আগন্তুক ॥ ষষ্টিচরণ! আপনার ছেলে বুঝি?

রাইমণি ॥ না, আমার সতীনের ছেলে।

আগন্তুক ॥ সতীন—সতীন—ও! —তা—আপনার নিজের ছেলে নেই!

রাইমণি ॥ না!—একটা শত্তুর ছিল—হারিয়ে গেছে!

আগন্তুক ॥ হারিয়ে গেছে?

রাইমণি ॥ তার পাঁচ বছর বয়সের সময় কুমীর ডুবি নদীতে স্নান করতে গিয়ে—আর—ফেরে নি।

আগন্তুক ॥ ডুবে গেছে?

রাইমণি॥ কি জানি! অনেক খোঁজা হয়েছে কিন্তুক লাস পাওয়া যায়নি। ওর বাপ টানা জাল ফেলেছেল নদীতে।—কিন্তুক এসব কথা শুনে তোমার কি হবে!

আগন্তুক॥ না এমনি! মনে হলো তাই জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা এমন তো হতে পারে যে আপনার সেই ছেলে আসলে নদীতে ডোবেনি।

রাইমণি॥ ডোবেনি!

আগন্তুক॥ না! হারিয়েও তো যেতে পারে।

রাইমণি॥ হারিয়ে! (আপন মনে) একদল বেদে এসেছিল তখন আমাদের গেরামে! বেদে—

[পাথর প্রতিমার মত স্থির হয়ে থাকে। গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ করে দূরাগত ড্রামের ধ্বনি শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে দূরাগত কণ্ঠধ্বনি—
"হুই বেদের খেল্যা দেখাবো গো! বাঁশ-চড়া, হাপু খেলা, ভোজবাজী দেখাবো গো—ডুম্ ডুম্ ডুম্—।

গুরুগম্ভীর মৃদঙ্গের শব্দ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। বেতালা বেসুরে। স্পট লাইটের আলো রাইমণির বিভ্রান্ত মুখের ওপর খেলা করে। উত্তেজনায় চাপা কণ্ঠে রাইমণি আগন্তুককে প্রশ্ন করে—]

তুমি কে?

আগন্তুক॥ আমি! বললুম তো পথ হারিয়ে এখানে আসছি। (রাইমণির বিশ্বাস হয় না কথাটা। এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আগন্তুকের মুখের দিকে। আগন্তুক সেটা গ্রাহ্য না করেই বলে যায়) আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, আপনার হারিয়ে যাওয়া ছেলে আবার ফিরে এলো! এখন সে নিশ্চয় অনেক বড় হয়েছে। রোজগার পাতিও হয়তো করছে! হয়তো অনেক টাকা কড়ি নিয়ে সে ফিরে এলো হঠাৎ! তাহলে খুব মজা হয়, না!—

[রাইমণি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুম্ মৃদঙ্গের ধ্বনিটা আবার শুরু হয়। আগন্তুক যখন কথা বলে তখন ধ্বনিটা থামে, কিন্তু রাইমণির মুখে স্পটের আলো পড়লেই ধ্বনিটা শোনা যায়।]

ওকি চুপ করে আছেন কেন? ছেলেটি ফিরে এলে ভাল হয় না? আপনাদের এই দুঃখের সংসারে সাহায্য হয়। বুড়ো বয়সের একজন ভরসা হয়!—

[স্পট লাইট গিয়ে পড়ে রাইমণির মুখের ওপর। ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুম্ মৃদঙ্গ ধ্বনি আরো বাড়ে বেতালাভাবে]

তারপর ধরুন বিয়ে হবে ছেলের! আপনার বউ আসবে ঘরে। ছোট্ট একটা বউ ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। রান্না করবে, ঘর নিকোবে, গোবরছড়া দেবে দাওয়ায়। সন্ধ্যে হলে তুলসী তলায় পিদ্দিম জ্বালাবে—

[আলোটা আগন্তুকের মুখ থেকে সরে গিয়ে রাইমণির মুখে পড়ে। ডুম্ ডুম্ মৃদঙ্গ বাদ্য বেতালা হয়ে ওঠে। বাজতে থাকে দ্রুতলয়ে। অন্ধকারের মধ্য থেকে আগন্তুকের কণ্ঠে শোনা যায়—]

তারপর নাতি পুতি আসবে এক এক করে। নাতি পুতি ঘর সংসার ভরে উঠবে!—খুব মজা হয়, না?

[রাইমণি হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে। আগন্তুক অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে]

ওকি—কি হলো! —আপনি কাঁদছেন কেন—

রাইমণি॥ (কান্নাভরা কণ্ঠে) তুমি অমন করে আমাকে লুভি করোনা গো! আমার ছেলে নেই! যে ছিল সে আমার শত্তুর। ছেলে নয় গো—ছেলে নয়— (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

আগন্তুক॥ ছি! ছি! আমি এমনি বলছিলুম কথাগুলো। আপনার মনে দুঃখ্যু হবে জানলে—শুনছেন—মা—মা—

[তীব্রবেগে ঘুরে দাঁড়ায় রাইমণি]

রাইমণি ॥ কে মা ! আমি কারুর মা নই ! আমারে ডেকোনি এই বলে—

[ঘটনার আকস্মিকতায় আগন্তুক হকচকিয়ে যায় ! রাইমণিও কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। নেপথ্যে মত্ত কণ্ঠে গান শোনা যায়।]

"ও বলরাম ফিরে যা তুই গৃহেতে।
নীলমণি ধন দিবে না মায় গোষ্ঠেতে ॥—"

ওই আসছে ষষ্ঠিচরণের বাপ !

[আগন্তুক উৎসুক দৃষ্টিতে আঙিনার দিকে তাকায়। একটি প্রায় নিষ্প্রভ হ্যারিকেন হাতে ঝুলিয়ে মত্ত রাখহরি বেতালা পায়ে প্রবেশ করে। আগন্তুক তাড়াতাড়ি উঠে যায়। প্রমত্ত রাখহরিকে হাত ধরে দাওয়ায় উঠতে সাহায্য করে।]

রাখহরি ॥ ঠিক আছে ! ঠিক আছে !

আগন্তুক ॥ আপনি নিশ্চয়ই এই বাড়ীর কর্তা—

রাখহরি ॥ কে বাবা তুমি ! রাজপুত্তুর ! বেড়ে জামাকাপড় পরেছো তো ! পায়ে এত কাদা কেন ! মুছে দেবো ?—(বসে পড়ে) রাজপুত্তুরের পা মুছে দি—

আগন্তুক ॥ আরে ছি ছি—পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন ?

রাখহরি ॥ রাজপুত্তুরের পা পুঁছিয়ে দিচ্ছি !—বাবার থানে পুন্নি করছি !—

[নাছোড়বান্দা রাখহরি আগন্তুকের পা ধরে টানতে যায়]

রাইমণি ॥ মরে এসেছে একেবারে। (ধাক্কা দেয়) শুনতিছ—

রাখহরি ॥ এঁ্যা !—কি হয়েছে ?

রাইমণি ॥ শুনে যাও ! ঘরে এসো একবার।

[রাইমণি রাখহরিকে ঘরে নিয়ে যায়। আগন্তুক বসে থাকে চুপ করে। ষষ্ঠিচরণ প্রবেশ করে ! আগন্তুককে দেখে তার দৃষ্টি হিংস্র হয়ে ওঠে। প্রশ্ন করে—]

ষষ্ঠি ॥ কে ?

আগন্তুক ॥ তুমি বুঝি এবাড়ীর ছেলে!

ষষ্টি ॥ সে খোঁজে তোর কি দরকার?

আগন্তুক ॥ তোমার নাম ষষ্টিচরণ।

ষষ্ঠী ॥ কে তুই?

[চেঁচামেচিতে রাইমণি বেরিয়ে আসে]

রাইমণি ॥ ষষ্ঠি!

ষষ্ঠি ॥ কে এটা?

রাইমণি ॥ বলতিছি! (আগন্তুককে) তুমি বাবা একটুক ঘরের মধ্যি যাও তো! ওর বাবা তোমারে ডাকতিছে!

ষষ্ঠী ॥ ও কে?

রাইমণি ॥ বলতিছি! যাও বাবা! যাও—

[আগন্তুকের ঘরের মধ্যে প্রস্থান ;]

শ্রীধর জ্যাঠা এয়েছেল!

ষষ্ঠি ॥ মরুকগে শ্রীধর জ্যাঠা! ও কে?

রাইমণি ॥ ও একটা ভবঘুরে।···কিন্তুক শ্রীধর জ্যাঠার মতলবটা ভাল নয়।

ষষ্ঠি ॥ কেন?

রাইমণি ॥ তোর কথা বলছিল।

ষষ্ঠি ॥ আমার কথা! কি কথা?

রাইমণি ॥ ঐযে সব জিনিসপত্তর তুই আনিস সেই কথা। আমাকে শুধাচ্ছিল।

ষষ্ঠি ॥ তুই বলেছিস!

রাইমণি ॥ না! শুধু ঘর থেকে তোর সেই জিনিসগুলো নে হেথায় এই খাতার ফাঁকে লুকোয়ে রেখেছি।

ষষ্ঠি ॥ (রেগে) ওই জিনিসে তুই কেন হাত দিয়েছিস! কে তোরে হাত দিতি বলেছে?

রাইমণি ॥ শ্রীধর জ্যাঠা ভয় দেখালো, তোর কথা পঞ্চায়েৎ সভাকে কয়ে দেবে!

ষষ্ঠি ॥ বলেছে ?

রাইমণি ॥ হ্যাঁ !

ষষ্ঠি ॥ শালাকে আমি…দেতো কুড়ুলটা…আজ রাতেই আমি শালাকে খতম করে আসি।

[কুড়ুলটা নিজেই তুলে নেয় দাওয়া থেকে]

রাইমণি ॥ ষষ্ঠি শোন বাবা, আগ করতে নেই, শোন…

[রাইমণি ষষ্টিকে শান্ত করার চেষ্টা করে। রাথহরি আর আগন্তুক ঘর থেকে দাওয়ায় আসে কথা বলতে বলতে।]

রাথহরি ॥ জঙ্গলে পথ হারিয়ে এখানে চলে এসেছো !

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ !

রাথহরি ॥ তা কোন্ গেরামে যাচ্ছিলে ?

আগন্তুক ॥ গ্রাম…গ্রাম…হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পাথর প্রতিমা !

রাথহরি ॥ পাথর প্রতিমা ! সে তো অনেক দূর ! এই গেরামের উল্টোদিকে।

আগন্তুক ॥ উল্টোদিকে ? ও…হ্যাঁ…তা হবে।

রাথহরি ॥ যাই হোক আজকের আত্তিরটার মতো থেকে যাও !…কিন্তুক খাবার কিচ্ছু নেই…

রাইমণি ॥ যা আছে তাই খেলেই হবে ! তোমরা বসো আমি ব্যবস্থা করতিছি।

[ওরা বসে দাওয়ায়। ষষ্টিচরণ আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন কথা বলে না। আগন্তুক ওদের দিকে তাকিয়ে বলে—]

আগন্তুক ॥ আমার কাছে কিন্তু অনেকগুলো টাকা আছে।

রাথহরি ॥ টাকা !

ষষ্টিচরণ ॥ টাকা !!

রাইমণি ॥ (যেতে যেতে ফিরে এসে) টাকা !!!

ষষ্টিচরণ ॥ কোথায় ?

আগন্তুক ॥ এই যে ! [পকেট থেকে নোট এবং খুচরোয় মিলিয়ে প্রায় হাজার খানেক টাকা সামনের ভাঙা টেবিলের ওপর রাখে। রাথহরি, ষষ্টিচরণ, রাইমণি সকলে হুমড়ী খেয়ে পড়ে টেবিলের ওপর ! রাথহরি বিস্ফারিত বিস্ময়ে টাকার দিকে তাকিয়ে থাকে।]

রাথহরি ॥ এতো টাকা !

আগন্তুক ॥ হাজার টাকা আছে।

রাইমণি ॥ হাজার !

[অসীম মমতাভরে টাকাগুলো স্পর্শ করে ও। রাথহরিও সাহস পেয়ে টাকাগুলো ছোঁয়। সাজায় ! খেলা করে। আগন্তুক স্মিত হাস্যে ওদের রঙ্গ দেখে। ষষ্টিচরণ একভাবে দাঁড়িয়ে একবার ওদের দিকে, আর একবার আগন্তুকের মুখের দিকে তাকায়। হাতের কুড়ুলটা শক্ত করে ধরে বজ্রমুষ্টিতে।]

আগন্তুক ॥ এই সব টাকা যদি তোমরা পেতে তাহলে বেশ হতো, না ?

রাথহরি ॥ আমরা ! আমরা কোথা থেকে এত টাকা পাবো ! কে দেবে আমাদের ?

রাইমণি ॥ এত ট্যাকা নিয়ে তুমি একা একা ঘুরেছ, যদি কেউ কেড়ে নিত ?

আগন্তুক ॥ কে আর নেবে !

ষষ্টিচরণ ॥ (বজ্রগর্জনে বলে) মা খেতে দে !

রাইমণি ॥ এঁ্যা, এই যে বাবা যাচ্ছি ! (আগন্তুককে) টাকাগুলো রেখে দাও বাবা। উ বড় বিষ—বড় নেমকহারাম—

ষষ্টিচরণ ॥ (একইভাবে) তুই পিণ্ডি দিবি কি না ?

রাইমণি ॥ এই যাই। (রাথহরিকে) এসো— (প্রস্থান)

[টাকা ছেড়ে ওদের উঠতে কারুর মন চায় না। তবু উঠে পড়ে। রাথহরি ইতস্ততঃ করে তারপর আগন্তুককে বলে—]

রাথহরি ॥ ইয়ার থেকে একটা টাকা আমাকে দেবে !

আগন্তুক ॥ একটা টাকা! মাত্র একটাকা?

রাখহরি ॥ হ্যাঁ! দু বোতল পচাই হতো!

আগন্তুক ॥ এ সব সরকারী টাকা—

রাখহরি ॥ সরকারী টাকা! (টাকাগুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর বাধো বাধো স্বরে বলে) থাক তাহলে—থাক—থাক!

[বিড় বিড় করতে করতে ঘরে চলে যায়। কুড়ুলটা দু হাতে চেপে ধরে ষষ্টিচরণ একইভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা চলে যেতে ও আগন্তুকের দিকে এগিয়ে আসে।]

ষষ্টিচরণ ॥ এত টাকা তুই কোথায় পেলি!

আগন্তুক ॥ সরকারী টাকা। (টাকা তুলতে তুলতে) সরকারী কাজ করি আমি। পাথর প্রতিমায় জমিদারদের খেসারৎ দিতে হবে বলে এ টাকা কাছারীতে পাঠাচ্ছে সরকার।

ষষ্টিচরণ ॥ তুই চোর!

আগন্তুক ॥ চোর! আমি!

ষষ্টিচরণ ॥ হ্যাঁ, সবটাকা চুরি করেছিস তুই। চুরি করে পালিয়ে এসেছিস।

আগন্তুক ॥ (হেসে ওঠে) চুরি করে পালিয়ে এসেছি আমি?

ষষ্টিচরণ ॥ চুপ!

[ষষ্টিচরণের হঠাৎ ধমকে আগন্তুক হকচকিয়ে যায়। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। কুড়ুল নিয়ে ষষ্টিচরণ এগিয়ে আসে ওর দিকে কয়েক পা। হিংস্র শ্বাপদের মত তাকিয়ে থাকে চোখে চোখ রেখে। কয়েক মুহূর্ত কাটে। তারপর বলে—]

থাবি চল।

[বলে আর তার কথার অপেক্ষা না করেই ঘরে চলে যায়। বিস্মিত আগন্তুক চুপ করে বসে থাকে। বাইরে মৃদু হাততালির ইশারা শোনা যায়। আগন্তুক তাকায় সেদিকে। আবার হাততালির শব্দ। সন্তর্পণে

চারদিক তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। মৃদু চন্দ্রালোকিত আঙিনায় দেখা যায় আর একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। আগন্তুক সেটা লক্ষ্য করে নেমে আসে আঙিনায়। উভয়ে এক কোণে গিয়ে দাঁড়ায়। [

আগন্তুক ॥ কে সুবল ?

সুবল ॥ কেমন চলছে !

আগন্তুক ॥ ভালো ! আমাকে ওরা চিনতে পারেনি !

সুবল ॥ চেনা দিবি না !

আগন্তুক ॥ এখন না।

সুবল ॥ ইটা কিন্তুক ভালো হচ্ছে না ! শেষে—

[ঘরের ভেতর থেকে ষষ্টিচরণ বেরিয়ে আসে। আগন্তুককে দেখতে না পেয়ে তাকায় এদিক ওদিক তারপর তার দৃষ্টি পরে আঙিনার দিকে। তাড়াতাড়ি বাঁশখুটির আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। সন্তর্পণে লক্ষ্য করে ওদের। আগন্তুক আর সুবল কি কথা বলে শোনা যায় না। শুধু দেখা যায় আগন্তুক কি যেন একটা সুবলের হাতে দিল। সুবল চলে গেল সেটা নিয়ে। আগন্তুক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে, তারপর ঘুরে দাওয়ায় আসে। ষষ্টিচরণ ত্বরিতগতিতে আত্মগোপন করে। দাওয়ায় উঠে কাউকে দেখতে না পেয়ে আগন্তুক ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলে যায়। সেই অবসরে শিকারী শ্বাপদের মত ত্রস্ত পায়ে ষষ্টিচরণ বাইরে আসে। কুড়ুল হাতে নিয়ে নেমে আসে আঙিনায়। আধো আলো আঁধারীতে দ্বিতীয়জনকে খোঁজে। পায় না। ফিরে আসে। দাওয়ায় উঠে ভাবে কিছুক্ষণ, তারপর বসে ভাঙা চেয়ারে। সার্টের পকেট থেকে পচাই-এর বোতল বার করে পান করে তরল পানীয়। কুড়ুলটা তুলে নেয়। তারপর সেটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।— সময় কাটে। খাওয়া সেরে রাধহরি বাইরে আসে। মুখে তার পরিতৃপ্তির হাসি।]

রাথহরি ॥ হে—হে—একেবারে বাচ্ছা! পাগোল একটা। (নেপথ্যের উদ্দেশ্যে) আমার বিছানায় উর শুবার ব্যবস্থা করে দাও।—হে—হে—বলে কিনা আমি ওর বাপের মত।

ষষ্টিচরণ ॥ ও চোর আছে।

রাথহরি ॥ চোর!—আরে না না। উ কথনো চোর লয়। না কক্ষুণো নয়।

ষষ্টিচরণ ॥ অত টাকা পয়সা! ও কোথায় পেলো?

রাথহরি ॥ চেহারা দেখে বুঝিস না উ ভদ্দরলোকের ছেলে।

ষষ্টিচরণ ॥ ভদ্দরলোক! চুরি করে বনের মধ্য দিয়ে পালাচ্ছিল। ও চোর আছে।

[আগন্তুক প্রবেশ করে]

আগন্তুক ॥ কে চোর? কোথায় চোর!

রাথহরি ॥ এ্যাঁ···না এই গেরামের কথা হচ্ছে। কত চোর জুয়াচোর আছে তার আর ঠিক কি!—তুমি ঘুমাও নাই?

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ! যাবো। (বসে। ষষ্টিচরণ ওর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে লয়ে বসে) আচ্ছা এই গ্রামের নাম কি?

রাথহরি ॥ বাবুরা বলে কেয়াকুঞ্জ আমরা বলি কেজুরি।

আগন্তুক ॥ বেশ সুন্দর গ্রাম।

রাথহরি ॥ প্রথম তো, তাই সোন্দর লাগছে। এ গেরামের মাটিতে বিষ আছে।

আগন্তুক ॥ বিষ!

রাথহরি ॥ হ্যাঁ, গরীবদের জন্যে বিষ আর বাবুদের জন্যে সোনা। ক্ষেতের ফসল ফলাবো আমরা, বাবুদের ঘরে সোনা উঠবে! পুকুরে, নদিতে থ্যাপলা আর টানা জালে শরীল পাত করবো, মাছ লে যাবে পাইকার মহাজন নৌকো ভর্তি করে সেই ক্যানিংই। আমাদের আছে কি?

গরমিট এসে মধু চাষ করে, সেইখানে যাও দুটি পেটভাতা গুজগার হয়। আর আছে কি?

আগন্তুক॥ তোমাদের পাইকার মহাজন, জোতদার যারা আছে তারা কিছু দেয় না?

রাখহরি॥ হ্যাঁ দেয় বৈকি। পচাই দেয়। খোরপোষের কবুল করে জন খাটাতি নে যায়, তারপর পচাই আর তাড়ি খাওয়ায়। পরথমটা মিনি-মাঙনায়, তারপর ঘটি বাটি, কুঁড়ে বন্ধকী নে! এই যে আমার কুঁড়ে দেখছো তা সব ওই শ্রীধর বন্ধকী নে রেখেছে। আর আমারে পচাই খাইয়েছে পেটপুরে।

আগন্তুক॥ আচ্ছা এখানে তো অনেকে সরকারের মৌ চুরি করে বাজারে বিক্রী করে। করে না?

[ষষ্টিচরণ তাকায় ওর দিকে]

রাখহরি॥ কে জানে!

আগন্তুক॥ সীমানার ওপারে থেকে চোরা চালানও তো হয়—

রাখহরি॥ কে জানে অতশত জানি না বাপু। তুমি যাও শোওগে যাও। কইগো ষষ্টির মা, নতুন বাবুর শোবার জায়গাটা পেতে দাও না।

আগন্তুক॥ থাই! (হাই তোলে) সারাদিন ঘুরে ঘুরে বড্ড ক্লান্তি এসেছে। আর সেকী একটু হাঁটা! জলে কাদায়, খানা খন্দ ডিঙিয়ে হাঁটতিছি তো হাঁটতিছি। বিভ্রান্তি হলে যা হয়। ঘুম আসতিছে—

[উঠে দাঁড়ায় আগন্তুক। যেতে যায় এমন সময় ষষ্টিচরণ ওর পথ আগলে দাঁড়ায়।]

ষষ্টিচরণ॥ দাঁড়াও। কে তুমি?

আগন্তুক॥ কেন বল দিকিনি! তুমি আমাকে তখন থেকে "কে তুমি", "কে তুমি" করতে লেগেছ?

ষষ্টিচরণ॥ তুমি তো এ গাঁয়ের নতুন আমদানী!

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ!

ষষ্টিচরণ ॥ মৌচুরি, আর সীমানায় চুরির কথা জানলে কি করে?

আগন্তুক ॥ জানলুম—শুনেছি—লোকমুখে শুনেছি!

ষষ্টিচরণ ॥ এই যে বললে বনে জঙ্গলে ঘুরেছ সারাদিন! লোকজন তুমি পালে কোথায়?

আগন্তুক ॥ লোক—ওই দু'একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছল।

ষষ্টিচরণ ॥ দু'এক জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছিল।—

রাখহরি ॥ আহা ওরে ছেড়ে দে রে ষষ্টি! যাও—যাও—তুমি ঘুমোয় গে। যাও।

ষষ্টিচরণ ॥ না! (অকস্মাৎ ওর গলা চেপে ধরে।) কে তুই! বল তুই কে? না হলে তোরে আমি এই হেথায় নিকেশ করে দেবো! বল—বল। [গলায় চাপ দেয়। দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। রাখহরি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।]

রাখহরি ॥ হেই ছাখ! হেই ছাখ—আরে এই ষষ্টি, হারামজাদা, খুনেটা। ছাড়—ওরে—ছাড়—

[দ্রুত রাইমণির প্রবেশ]

রাইমণি ॥ কি হয়েছে! ওমা, বাছাটারে মারি ফ্যালল যে! এই ষষ্টি, হারামজাদা, শয়তান! (রাখহরিকে) দাঁড়ায়ে দেখছো কি ছাড়িয়ে দাওনা।

[রাখহরি দাওয়ায় গড়ান দুজনকে ছাড়াতে চেষ্টা করে। ব্যর্থ হয়। রাইমণি বাঁশের টুকরোটা নিয়ে ষষ্টিকে মারতে থাকে।]

রাইমণি ॥ ছাড়! ছাড়! হতভাগা, খুনে রাক্ষস! (ওদের টানা হ্যাঁচড়া আর মারের চোটে দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে দেয়। হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে দাঁড়ায় দু'জনে।) দেখেছো, দেখেছো, কি করেছে দেখেছো

কপালটা!…ও খুনে ডাকাত বাবা, তুমি ওর কাছে যেওনা। যাও ঘরে যাও। তোমার শয্যা আমি বিছিয়ে দিছি।—

[হাঁফাতে হাঁফাতে আগন্তুক ভেতরে চলে যায়। ষষ্টিচরণ সেদিক দেখে, হিংস্র কণ্ঠে বলে ওঠে]

ষষ্টিচরণ ॥ শালা! (ফিরে এসে বসে! জামা দিয়ে মুখ মোছে।) আমি চিনতি পেরেছি শালারে এতক্ষণে!

রাইমণি ॥ চিনতি পেরেছিস? কে ও!

ষষ্টিচরণ ॥ থাম তুই।—(রাখহরিকে) ও শালা পুলিশের লোক।

রাইমণি ॥ পুলিশ!!

ষষ্টিচরণ ॥ চোরা চালানের তদন্ত করতি এসেছে!

রাখহরি ॥ আমারও তাই মনে হয়।

রাইমণি। কিন্তুক অমন সোন্দর ছেলেটা! আমারে মা বলে ডাকলে!

ষষ্টিচরণ ॥ তবে আর কি, অমনি গলে জল হয়ে গেলি। আর কাল ভোর বেলায়—য্যাখন আমার হাতে দড়ি দেবে, আমারে ফাঁসিতি লটকাবে—ত্যাখন কি হবে? ত্যাখন আমারে বাঁচাবি তুই? ওর সব দলবল আছে এই গেরামে। একটাকে আমি নিজির চোখে দেখেছি।

রাখহরি ॥ তুই দেখেছিস!

ষষ্টিচরণ ॥ হ্যাঁ! এই উঠোনেই এসেছিল। তোমরা স্যাখন ঘরে ছিলে সেই অবসরে ও তার সঙ্গে গুজুর গুজুর করতিছেল। লোকটাকে অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতি পারিনি।

রাখহরি ॥ তোর জিনিসপত্তরগুলো কোথায় থুয়েছিস!

রাইমণি ॥ সে আমি রেখেছি লুকিয়ে।

রাখহরি ॥ মৌ-এর হাঁড়ীগুলো!

রাইমণি ॥ সে গোয়ালের দিকি আছে।—কিন্তুক ও যদি পুলিশ হয়, তাহলে

কি হবে! পাতোঃকালেই তো দলবল নে এসে বাড়ী একেবারে চষে ফেলে দেবে! ত্যাখন কি উপায় হবে!

রাখহরি ॥ এক কাজ করি। চল আমরা পালিয়ে যাই।

রাইমণি ॥ তাড়ি খেয়ে মগজে একেবারে ঘাঁটা পড়ে গেছে। পালিয়ে যাবি! কোথায় যাবি এই রেতের বেলা অত জিনিস সঙ্গে নিয়ে?

রাখহরি ॥ তাহলে উপায়!

ষষ্টিচরণ ॥ উপায় আছে!

রাখহরি ॥ কি? (ষষ্টিচরণ আর কোন কথা না বলে কুড়ুলটা তুলে নেয়।)

ষষ্টি ॥ আছে উপায়!

রাইমণি ॥ (চীৎকার করে ওঠে) না—না—

ষষ্টিচরণ ॥ চুপ্।

রাইমণি ॥ না! ওগো তুমি সামলাও খুনেটারে!

রাখহরি ॥ কিন্তুক লাস কি হবে!

ষষ্টিচরণ ॥ বস্তা বেঁধে কুমীর ডুবি নদীতে ভাসিয়ে দেবো!

রাইমণি ॥ না—না—ওগো তোমরা কি পাগোল হলে!—ও আমারে মা বলে না—না—

ষষ্টিচরণ ॥ চুপ কর! নৈলে তোরেও চুপিয়ে রেখে দেবো আজ।—সরে যা!

[ঠেলে সরিয়ে দেয়! ছিটকে পড়ে রাইমণি।]

রাখহরি ॥ কিন্তুক ও যদি জেগে থাকে! যদি পিস্তল থাকে ওর কাছে! পুলিশির কাছে গাদা বন্দুক থাকে আমি দেখেছি।

[ষষ্টিচরণ, রাইমণিকে টেনে তোলে।]

ষষ্টিচরণ ॥ তুই যা! ও ঘুমিয়েছে কি না দেখে আয়! যা! (চোখের জল মুছতে মুছতে রাইমণির প্রস্থান) খবরদার ঘুমিয়ে পড়ে থাকলি যেন জেগে না ওঠে।

রাখহরি ॥ অনেক টাকা আছে ওর কাছে! অনেক টাকা!

ষষ্টিচরণ ॥ আবার জোতজমি হবে।

রাখহরি ॥ খেতি পাবো পেটপুরে!

ষষ্টিচরণ ॥ রেতের অন্ধকারে এই কাজের কথা কেউ জানতি পারবে না।

রাখহরি ॥ কুমীর ডুবির কুমীররা রাতারাতি পেটে পুরে ফেলবে ওর লাশ!

ষষ্টিচরণ ॥ চাঁদ ডুববে একুণি!

রাখহরি ॥ পচাই আছে?

ষষ্টিচরণ ॥ এই নাও! [পকেট থেকে বোতল বার করে দেয়। হিংস্রভাবে বোতলটা আঁকড়ে ধরে রাখহরি। খানিকটা তরল আগুন ঢেলে দেয় গলায়। পাশব তৃষ্ণা মেটে। রাইমণির প্রবেশ।]

ষষ্টিচরণ ॥ কি হলো!

রাইমণি ॥ ঘুমোর!

[লাফিয়ে ওঠে রাখহরি]

রাখহরি ॥ দে আমারে দে কুড়ুলটা।

ষষ্টিচরণ ॥ তুমি যাবে।

রাখহরি ॥ হ্যাঁ। এসব কাজে হাতের জোর লাগে। তুই ছেলে মানুষ, তোর হাতের জোর নাই। দে।

[কুড়ুল নিয়ে রাখহরি সন্তর্পণে দরজার কাছে যায়। ফিরে এসে বলে।]

চীৎকার দিলে ভয় পাসনি।

ষষ্টিচরণ ॥ তুমি যাও। আর এক পহরের মধ্যি চাঁদ ডুবে যাবে। নিশুত হবে আস্তা।

[রাখহরি আবার এগোয়। ফেরে দরজার কাছ থেকে]

রাখহরি ॥ মুখটা বেঁধে দিলে হয়।

[ষষ্টিচরণ আড়া থেকে একটা বস্তা টেনে ছুঁড়ে দেয়]

ষষ্টিচরণ ॥ এই নাও।

[বস্তাটা নিয়ে রাখহরি ঘরে চলে যায়। রাইমণি আর ষষ্টিচরণ বসে থাকে।]

রাইমণি ॥ ইটা ভাল হলনি। আমার বুকের মধ্যি যেন কেমন করতিছে।

ষষ্টিচরণ ॥ চিল্লাস না !

রাইমণি ॥ ও আমাকে মা বলে ডেকেছিল— [ফোঁপায়]

ষষ্টিচরণ ॥ কাঁদিস না বলছি।

[রাইমণি চুপ করে যায়। দু'জনে বসে থাকে। সন্তর্পণে রাখহরির প্রবেশ। থরথর করে কাঁপছে লোকটা। দাওয়ায় এসে কুড়ুলটা ফেলে দেয়।]

রাইমণি ॥ কি হলো !

রাখহরি ॥ পারলুম না। ওর ঘুমন্ত মুখটা বড় সোন্দর লাগল। পারলুম না !

ষষ্টিচরণ ॥ তোমাকে পারতেই হবে !

রাখহরি ॥ না, না !

ষষ্টিচরণ ॥ কাল সকালে সব চোরাই মাল ধরে ফেলবে।

রাখহরি ॥ হঁ্যা—

ষষ্টিচরণ ॥ ফাঁসীতে লটকাবে আমাদের—

রাখহরি ॥ হঁ্যা, হঁ্যা।

ষষ্টিচরণ ॥ ই ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যদি জেগে ওঠে সর্বনাশ হবে ! যাও !

রাখহরি ॥ পচাই ! পচাই দে !

ষষ্টিচরণ ॥ পচাই নাই।

রাখহরি ॥ আমি পচাই খেয়ে আসি। এক বোতল, দু বোতল, পাঁচ বোতল। শরীলের রক্ত মাথায় তুলে আসবো। একুণি আসবো। একুণি—

[প্রায় ছুটে বেরিয়ে যায় রাখহরি। ওরা দুজনে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

রাইমণি ॥ আবার মাতাল হতে গেল।

ষষ্টিচরণ ॥ ভীতু।

রাইমণি ॥ ভালই হয়েছে। ওসব কাজের দরকার নাই।

ষষ্টিচরণ ॥ এক হাজার টাকা।

রাইমণি ॥ কি হবে টাকায়! কচু সেদ্ধ অনেক ভালো।

ষষ্টিচরণ ॥ কাল ওর দলবল আসবে!

রাইমণি ॥ সব মিথ্যে কথা, ওর সঙ্গে কেউ নেই!

ষষ্টিচরণ ॥ আমি নিজে চোখে দেখেছি।

রাইমণি ॥ চাঁদের আলোয় ভুল দেখেছিস!

ষষ্টিচরণ ॥ না! ও তার সঙ্গে কথা বলেছে, তাকে একটা কি দিয়েছে।

রাইমণি ॥ দিক!

ষষ্টিচরণ ॥ না! [উঠে পড়ে।]

রাইমণি ॥ কোথায় যাচ্ছিস!

ষষ্টিচরণ ॥ আমি করবো!

রাইমণি ॥ ষষ্টি! শোন! ষষ্টি!

ষষ্টিচরণ ॥ চিল্লাস নি! আজ মাথায় আমার খুন চেপেছে।

রাইমণি ॥ না—না—শোন—কথা শোন! টাকা দেখে এদের সব মাথায় আগুন জ্বলেছে···আমি কি করি···

ষষ্টিচরণ ॥ সরে যা।

[কুড়ুল নিয়ে ষষ্টি এগিয়ে যায় ঘরের দিকে]

রাইমণি ॥ ষষ্ঠি!

ষষ্ঠিচরণ ॥ গোলমাল করিসনি বলছি!

রাইমণি ॥ শোন···আমাদের এখানে আসতে ওকে যদি কেউ দেখে থাকে?

ষষ্ঠিচরণ ॥ কেউ দেখেনি! ও বনের মধ্যে দিয়ে এসেছে!

রাইমণি ॥ কিন্তু ও যে বলছিল একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ষষ্টিচরণ ॥ মিথ্যে কথা।

[এগিয়ে যায়। এমন সময় দরজা খুলে আগন্তুক বেরিয়ে আসে। ষষ্টিচরণ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাতের কুড়ুলটা লুকিয়ে নেয় পেছন দিকে।]

রাইমণি ॥ কে?

ষষ্টিচরণ ॥ তুমি ঘুমোও নি!

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ! ঘুমুচ্ছিলুম, কিন্তু···তোমার বাবা কোথায়?

রাইমণি ॥ ওর বাবা বাড়ী নেই!

আগন্তুক ॥ বাড়ী নেই! এত রাত্তিরে [পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে]

ষষ্টিচরণ ॥ সোনার ঘড়ি!

রাইমণি ॥ সে গেছে পচাই খেতে! রোজ যায়!

ষষ্টিচরণ ॥ তাকে কি দরকার?

আগন্তুক ॥ না—একটা কথা বলবার ছিল। (রাইমণিকে) তোমাকে বললেও চলে···কিন্তু···

রাইমণি ॥ কি কথা! বল!

আগন্তুক ॥ না থাক···কাল সকালেই বলবো।···

ষষ্টিচরণ ॥ কাল সকাল...

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ! সকালে তোমাদের সকলের সামনে।···খুব মজার কথা···

ষষ্টিচরণ ॥ হ্যাঁ, তাই বলো, কাল সকালেই কথা বলো তুমি!

রাইমণি ॥ যাও বাবা, ঘুমোও গে!

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ...যাই.. [দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ ফিরে বলে] তোমরা ঘুমোও নি!

রাইমণি ॥ আমরা গল্প করছি...

আগন্তুক ॥ আচ্ছা!...কথাটা বলতে বড় সাধ হচ্ছে···না···আচ্ছা শোন···

রাইমণি ॥ কি?

আগন্তুক ॥ তোমরা জানতে চেয়েছিলে না, আমি কে...আচ্ছা থাক...

রাইমণি ॥ বলো না···বলো না তুমি কে···

আগন্তুক ॥ না থাক, কাল বলবো।

রাইমণি ॥ না—না—আজ বলো...তোমার ভালো হবে—বলো—

আগন্তুক ॥ বলবো বৈকি। বলবার জন্যেই তো আমি এসেছি—তবে আজ নয়—কাল—কাল সকালে—(আপন মনে) উঃ, কতদিন—কতদিন পর— [প্রস্থান]

ষষ্টিচরণ ॥ ও জেগেছিল।

রাইমণি ॥ আমাদের কথা শুনেছে।

ষষ্টিচরণ ॥ কি জানি।...কি কথা বলতি চায় ও ?

রাইমণি ॥ বললে না তো।

ষষ্টীচরণ ॥ কাল সকালে বলবে—কাল সকাল—

[কুড়ুলটা মুখের কাছে তুলে ধার পরীক্ষা করে]

ওর নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে—কিন্তুক—না—আর দেরী না—

রাইমণি ॥ (চাপাস্বরে) ষষ্টি।

ষষ্টিচরণ ॥ (চাপাস্বরে) চুপ্।

[সন্তর্পণে এগোয় দরজার কাছে। ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। রাইমণি অধীর উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে থাকে ষষ্টিচরণের দিকে। ষষ্টিচরণ ফেরে রাইমণির দিকে]

এই

রাইমনি ॥ কি ?

ষষ্টিচরণ ॥ শুয়েছে মুড়ি দিয়ে—

[হিংস্র শার্দুলের মতো পা টিপে টিপে ঘরে ঢোকে। অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে রাইমণি। সময় কাটে। অনেকক্ষণ কোন শব্দ পাওয়া যায় না।—তারপর একটা ধড়মড় করে আওয়াজ হয়। রাইমণি চমকে ওঠে]

রাইমণি॥ (চীৎকার করে) না—না—ও আমারে মা বলে ডেকেছে—না ষষ্টি—ষষ্টি ও আমারে মা বলে ডেকেছিল—(এই সময় একটা তীব্র আর্তনাদ শোনা যায়। থেমে যায় রাইমণি ভুতগ্রস্ত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। কাছে এগিয়ে যেতে ভরসা পায় না। একটু পরে কুড়ুল হাতে করে ষষ্ঠীচরণ বেরিয়ে আসে। আরো হিংস্র দেখায় তাকে। নিজের জামা খুলে তাই দিয়ে কুড়ুলটা মোছে।)

ষষ্টিচরণ॥ ব্যস। খতম।

[রাইমণি কোন কথা বলে না। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে।]

শালা টিকটিকি। (কুড়ুলটা, নিজের জামাটা, থলের মধ্যে ভরে বাণ্ডিল বাঁধে!) হাজার টাকা…এক হাজার…শহরে যাবো…পান বিড়ির ব্যবসা করবো।…শালা আর এই গেরামে না। রাধিরে সঙ্গে নে যাবো। ওরে আমি বিয়ে করবো…দিবি নে ওর বে আমার সঙ্গে…

[ষষ্টিচরণের কোন কথার জবাব দেয় না রাইমণি।]

শালা বড় বেগ দিয়েছে। মরার সময় তোরে মা বলে ডেকেছিল…

[রাইমণি সামান্য ফুঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু কোন কথা বলে না।]

যা—শালা। কাল কুমীরডুবি নদীতে মেছো কুমীরদের মোচ্ছব লেগে যাবে। …উদ্ধার হয়ে যাবি তুই…

[বাইরে পদশব্দ ও কথাবার্তা শোনা যায়।]

কে?

[শ্রীধর ও সুবল মাতাল রাখহরিকে নিয়ে প্রবেশ করে।]

শ্রীধর জ্যাঠা! সুবলা, তুই!

শ্রীধর॥ তোমার বাবার জ্বালায় কি আর দুদণ্ড থির হবার জো আছে, বাবা ষষ্টিচরণ! রাতবিরেতে ঘরে যেয়ে হামলা শুরু করেছে, পচাই দিতি হবে! দেখ দিকিন কাণ্ডখানা! য্যাতো বোঝাই কিছুতে বোঝে না! শেষে দু'বোতল ঘরের ইষ্টক থেকে বার করে দে তবে রেহাই

পাই !…ন্যাও গো রাই…তোমার গুণধর মরদকে ধর। মাথায় জল টল ঢালো…তারপর ষষ্টিচরণ তোমার খবর কি ?

[অচৈতন্য রাধহরিকে দাওয়ায় শুইয়ে দেয়]

ষষ্টিচরণ ॥ ভালো

শ্রীধর ॥ কাল একবার বেড়াতে বেড়াতে যেও দিকি আমার উদিকে। দুটো কথা আছে বলবার।

ষষ্টিচরণ ॥ আচ্ছা !

সুবল ॥ অর একজনারে দেখ্‌ছি না !

ষষ্টিচরণ ॥ আর একজন…আর একজন কে ?

সুবল ॥ হি হি সেইটেই তো মজা !…ঘুমাচ্ছে বুঝি…কিন্তুক কথাটা যে আর চেপে রাখতি পারিনে…পেট যে আমার দমসম হয়ে গেল ! ও কাকা, বলো না গো…আমার যে কথা ভাঙতি মানা…

শ্রীধর ॥ কি গো রাইমণি, ঘরে যে ঘুমুচ্ছে তারে চিনতি পারলে !

ষষ্টিচরণ ॥ কে ঘুমুচ্ছে ঘরে !

শ্রীধর ॥ আজ সন্ধ্যেবেলা যে এসেছে তোমাদের ঘরে। এক হাজার টাকা আর একটা সোনার ঘড়ি সঙ্গে করে নে ! বলেছে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে তোমার ঘরে আশ্রয় চায়।

[রাইমণি পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে থাকে]

কথাই যে বলছো না রাইমণি !

ষষ্ঠীচরণ ॥ কে সে !

সুবল ॥ গেরামে ঢুকতিই আমার সঙ্গে দেখা ! আমি ঠিক চিনেছি। তা সন্দ করতে ত্যাখন সব খোলাখুলি বলল…

ষষ্টিচরণ ॥ কি বলল…

সুবল ॥ না বাবা সে আমারে দিয়ে বাবার থানে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে। আমি বলবো নি ! রাতে একবার তাও এসেছিনু এখানে…

বষ্টিচরণ ॥ তুই এসেছিলি সন্ধ্যের সময় !

সুবল ॥ হ্যাঁ ! এই যে এটা আমারে দিয়ে বলল, এটা নে তুই কাল সকালে আসিস···সবই তো বলে ফেলনু, তুমি বলনা কাকা—

শ্রীধর ॥ আমি আর কি বলবো। এতক্ষণে কি আর ওরা না জেনেছে !··· তোমায় ছেলে গো রাইমণি···তোমার ছেলে···

বষ্টিচরণ ॥ কে ?

শ্রীধর ॥ তোমার ছোট ভাই ! সেই যে হারিয়ে গিয়েছিল। আসলে তাকে বেদের ধরে নে গেসল ! তাদের কাছ থেকে পাইলে শহরে গিয়ে— না না জায়গায় ঘুরে ঘুরে পরে এট্টা দোকান দিয়েছে শহরে। ইলেকটিরিকের দোকান। সে অনেক কথা। সন্ধ্যেবেলা আমার ওথানে বসে সব বলল। বললে এবার বাবা-মাকে সঙ্গে নে যাবে ! ও অনেক টাকা আয় করে···আর, তোদের দুঃখ্যু থাকবে না ! বললুম এক্ষুণি গিয়ে বল তোর মাকে। তা বললে, না। আগে বাড়ী যেয়ে দেখি আমারে মা চিনতি পারে কিনা। যদি চেনে তো ভালই···আর যদি না চেনে তো কাল সকালে সব বলবো ! আমারে আর সুবোলেরও আসতে বলেছিল সকালে। কি গো, কথা বলছো না কেন ?

রাইমণি ॥ সে আমারে মা বলে ডেকেছিল—

শ্রীধর ॥ ডাকবেই তো। তোমার ছেলে তোমারে মা বলে ডাকবে না তো আর কারে ডাকবে।—তা যাই—ও বোধহয় ঘুমাচ্ছে—ঘুমাক এখন, কাল সকালে সবাই আসবো। এক হাজার টাকা এনেছে সঙ্গে করে তোমার ছেলে—ভোজ দেবে বলেছে আমাদের। আয় সুবল।···রাথহরিরে একটু দেখো রাই— [প্রস্থান]

[রাইমণি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। বষ্টিচরণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

বষ্টিচরণ ॥ মা—

[রাইমণি নিস্পন্দ, নিথর। কাক ডাকে।]

ভোর হয়ে গেল—

[আবার হিংস্র হয়ে ওঠে যষ্টিচরণ! কুড়ুল আর বাণ্ডিলটা নিয়ে, হিংস্র শ্বাপদের মত সে ছুটে বেরিয়ে যায় অঙ্গনের দিকে। মিশে যায় আলো অন্ধকারের মধ্যে। রাখহরি শুয়ে আছে দাওয়ায়! অজ্ঞান, অচৈতন্য। রাইমণি একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মুখে স্পট লাইটের আলো পড়ে। থর থর করে কাঁপছে রাইমণি। শেষ পর্যন্ত আর উদ্গত অশ্রু দমন করতে পারে না, ককিয়ে কেঁদে উঠে অচৈতন্য রাখহরির পাশে আছড়ে পড়ে বজ্রাহত বনস্পতির মত।]

যবনিকা

---

* রূপার্ট ব্রুকের "লিথুয়ানিয়া" নাটকের অনুসরণে।